নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

(প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

অগ্রহায়ণ ১৩২১—বৈশাখ ১৩২২)

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়—২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নারায়ণের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ৩৷০ টাকা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য সাধারণতঃ ।/০ আনা এবং ডাক মাশুল /০ আনা। সচিত্র বিশেষ সংখ্যার মূল্য ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

---

২০ নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ ১৩২১—বৈশাখ ১৩২২

প্রথম খণ্ডের

সূচীপত্র।

[বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক।]

সূচীপত্র।

[লেখক ও লেখিকাগণের নামানুসারে]

নারায়ণ

স্তব

নমস্তে নারায়ণ!

তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসি-অশ্রুময় জীবন, সুখে-দুঃখে পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা। তুমি যখন আপনাকে লুকাইয়া রাখ তখনি সংসার মায়ার খেলা হইয়া উঠে। তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ। সকল সংসার তোমার লীলাভূমি।

নায়কনায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য এবং প্রভু ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপরদিকে ভক্তি—এইসব লইয়াই ত সংসার, এইসব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমিই ত এই সকল রসকে সার্থক কর। সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি; আর যাহা কিছু সব ত উপলক্ষ্য।

ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল্যরস ত তোমারই

দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে জননী শিশুরূপী তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনি তাঁহার প্রাণে ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনি তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনি উপভোগ করেন। নায়কনায়িকার যে মাধুর্য্যরস তাহাও তোমারই পানে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়কনায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি-অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে, তোমারই মাধুর্য্যরসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সকল দাস্যের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে প্রভুরূপে, না দেখা দাও, ততক্ষণ তাহারা "কই সখা, কই প্রভু" বলিয়া এই সংসার-অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্যকে সার্থক করিয়া তুল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়, সকল নরের তুমি সমষ্টি, সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমিই জাতীশ্বর। তুমিই বিশ্বমানব;—অতীত মানব তোমারই বুকে লুকাইয়া আছে, বর্ত্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতেছে, আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এক অপূর্ব্ব অসংখ্য-দল পদ্মের মত তোমারই বক্ষে ফুটিয়া আছে। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; অনাদি তুমি, আদি তুমি; অনন্ত তুমি, সান্ত তুমি। তুমিই নরনারায়ণ।

তুমি যেমন জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অবলম্বন। প্রভো! জীব ছাড়াও তোমার চলে না। লীলা-প্রয়োজনহেতুই ত তুমি জীবকে তোমার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে। সে জীব ছাড়া তোমার লীলা সম্ভব হয় না। তুমি নিত্যই এক, আর নিত্যই দুই হইয়া আপনার মধ্যে লীলা কর। তুমি এক হইয়াও

লীলারসে বিভোর হইয়া অনন্তরূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচরণ কর। তুমি যখনি তোমার বিশ্ববীণায় ঝঙ্কার দেও তখনি সকল বিশ্বের কবি গান গাহিয়া উঠে। কা'র সে সঙ্গীত, প্রভো! তুমি ছাড়া কেই তাহা সম্ভোগ করে। তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর,—আবার তুমিই সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর। তুমি প্রভু হইয়া দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া গ্রহণ কর। তুমিই নায়কনায়িকা হইয়া প্রেমলীলার অভিনয় কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেমচুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

সকল ভোগের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ! তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলাপরিপূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফুর্ত্তি। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা!

নমস্তে নারায়ণ!

অন্তর্যামী

যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই,
মনে রেখো আমি শুধু তোমারেই চাই!
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সে দিন হইতে, বঁধু! আলোকে আঁধারে,
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে!
তোমারে পেয়েছি কি গো? তা'ত মনে নাই,—
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই!
শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি হেলা,
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা?
সে দিন তোমারে, বঁধু! পারিনি ধরিতে,
আমার খেলার মাঝে মোরে খেলাইতে।
প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই;
পুষ্পিত, ঝঙ্কৃত সেই, আলোক আগারে,
কেমনে রাখিলে, বঁধু, আপনা লুকাই!
আমার সুখের মাঝে সুখ খুঁজি নাই,
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে, তোমারে শুধু! পাই বা না পাই;—
বঁধু হে! তোমারি লাগি আকুল পরাণ!
বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই,
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই!

নূতনে পুরাতনে

ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া, একদিন আমরা নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার জন্য একটুও দুঃখ করি না। গতানুগতিক শ্রদ্ধাটুকু একবার একরূপভাবে ভাঙ্গিয়া না গেলে সত্যশ্রদ্ধালাভ কখনই সম্ভব হইত না।

তখন আমাদের চক্ষে বিদেশের প্রায় সকলই ভাল লাগিত, আর স্বদেশের প্রায় সকলই স্বল্পবিস্তর মন্দ ঠেকিত। সে ভাবটা ক্রমে কাটিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি সেইরূপ বিচারবিবেচনা-বিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। একদিন আমরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম; আজ সে দিকে বাড়ি খাইয়া, ফিরিয়া আসিয়া ঐ পুরাতন ঘরকেই অচলায়তন করিয়া তুলিতেছি। সত্য কথাটা তাহা নয়

যখন আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম, তখন ঐরূপ বাহিরে যাওয়াই আমাদের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যে সকল মমতা কাটাইয়া কোনও দিন ঘরের বাহিরে চলিয়া যায় না, সে ঘরের মর্য্যাদাও কখনও বুঝিতে পারে না। প্রবাসের বেদনা ও পরদেশীর উপেক্ষা সত্যিযাই লোকে আপনার ঘর ও আপনার জন যে কি বস্তু, ইহা সত্যভাবে বুঝিতে পারে। যে ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, কিম্বা হদ্দমুদ্দ উঠানে যাইয়া নিরাপদে দাঁড়াইয়া দূরের পথের আবছায়ার ধ্যান করে, তার পক্ষে এ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না।

ফলতঃ, যে মন বাহিরে ছুটিয়া গিয়াছিল সেই যে ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহাও নহে। সেই মানুষই আসে বটে, কিন্তু সে মন আসে না। নূতন প্রেম, নূতন দৃষ্টি লইয়া সে ঘরে ফিরিয়া আইসে।

আগে যে বস্তুকে যে চক্ষে দেখিত, সেই চক্ষেই যে এখনও দেখে, তাহা নয়। সে চক্ষু থাকিলে, সেই ভাবও থাকিত। সে ভাব থাকিলে, সে পুরাতন অভক্তিও থাকিত। ভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে, যেখানে অশ্রদ্ধা ছিল, সেখানে শ্রদ্ধা জাগে না।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়"। আমাদের স্বদেশের প্রতি এই বিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে। এই নববিশ্বাসই আমাদের নূতন স্বাদেশিকতার প্রাণ। আর কেবল বর্ত্তমানের সত্যের উপরেই নহে, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপরেও এই নূতন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কা'র ভিতরে কতটা কি সম্ভাবনা আছে, ইহা দেখিতে হইলে, প্রেমের কাজল চক্ষে মাখিতে হয়। লোকে বলে বটে, প্রেম অন্ধ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেম যতটা দেখে, অপ্রেম বা ঔদাসীন্য তার শতাংশের একাংশও দেখিতে পায় না। অপ্রেম অপূর্ণতাই খুঁজিয়া বেড়ায়, কারণ যাহা দেখিতেছে তাহার মধ্যে সুন্দর ও পরিপূর্ণ কিছুই নাই, এই জ্ঞান বা ধারণাকে আশ্রয় করিয়াই অপ্রেম বাঁচিয়া থাকে। যার জীবনের জন্য যে বস্তুর যেটুকু প্রয়োজন সে তা'ই খুঁজিয়া নেয়। আর অপ্রেম যেমন বস্তুর মন্দটাই দেখে, ঔদাসীন্য সেইরূপ বস্তুর উপরটা মাত্র দেখে। এক প্রেমই বস্তুর সকলটা দেখে, ছায়ার সঙ্গে তার আতপটুকুও দেখে, মন্দের সঙ্গে তার ভালটুকুও দেখে, বস্তুটী যেমন আছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে, তাহা কত বড়, কত সুন্দর হইতে পারে, ইহাও প্রত্যক্ষ করে। বস্তুর সমগ্র জ্ঞানের উপরেই প্রেম গড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রেম যতটা দেখে, আর কেউ ততটা দেখিতে পারে না।

স্বদেশকে আমরা যখন অশ্রদ্ধা করিতাম, তখন তাহার প্রতি আমাদের এই প্রেম জন্মায় নাই। প্রেমের অভাবে তার বাহিরটাই কেবল দেখিয়াছিলাম, ভিতরটা দেখিতে পাই নাই, তার এক দেশ মাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সমগ্রকে চাক্ষুষ করিতে পারি নাই। আজ নূতন প্রেমে সেই পূর্ণবস্তুকে দেখিতেছি বলিয়াই, তার

মন্দের সঙ্গেই যে ভালটুকুও জড়াইয়া আছে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর ঐ ভালটুকুর জন্যই জোর করিয়া মন্দটুকুর উপরে আঘাত করিতে ভয় পাই।

ফলতঃ, ভাল মন্দ দুটা এমন একান্ত বিচ্ছিন্ন বস্তু নয় যে, একটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়। টানাহিঁচড়া করিয়া কোনও জীবন্ত বস্তুর গঠনগত বা প্রকৃতিগত ভালমন্দকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করা যায় না। জীবন্ত বস্তুর ভালটাকে বাড়াইয়া দিয়া ও ফুটাইয়া তুলিয়াই ক্রমে ক্রমে তার মন্দটাকে নিরস্ত করিতে হয়। এক্ষেত্রে আর কোনও উপায়ান্তর নাই। জোরাবরি করিলে শেষে জীবের জীবন লইয়াই টান পড়ে।

এই জনাই জোরজবরদস্তি করিয়া কাহাকেও ভাল করিতে ভয় পাই। নিজের পুত্র কন্যার উপরেও জোর চালাইতে চাহি না, নিজের সমাজের উপরেও নয়। যার প্রকৃতিতে যা নাই, বাহির হইতে বা উপর হইতে তার উপরে তাহা চাপাইতে গেলে তাহাতে কোনও ইষ্ট হয় না, বরং অনিষ্টেরই আশঙ্কা বেশী হইয়া থাকে।

এক দিন এই জ্ঞান জন্মায় নাই। তাই য়ুরোপের ভালটাকে তখন জোর করিয়া আমাদের নিজেদের সমাজের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাহাকে য়ুরোপের মতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। য়ুরোপ যে য়ুরোপ, আর ভারত যে ভারত, এরা যে দুইটা বিশিষ্ট সমাজ, এবং বিশিষ্ট বলিয়াই যে ইহাদের নিজস্ব একটা অন্তঃপ্রকৃতি, এবং সেই প্রকৃতি অনুযায়ী এক একটা বহির্গঠন আছে; আর সমগ্র, সম্পূর্ণ, মনুষ্যত্বের গোটা বীজটা যে সমভাবে উভয় সমাজের গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে; ঐ বীজকে ফুটাইয়া তুলা যে উভয়েরই সমান লক্ষ্য, উহাতেই যে উভয় সমাজেরই চরম সার্থকতা,—এ সকল কথা তখন বুঝি নাই। বৈষম্যের ভিতর দিয়াই যে সাম্য, বিচিত্রতার মধ্য দিয়াই যে প্রকৃত একত্ব আপনাকে নিয়ত অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; বৈষম্য না থাকিলে সাম্য যে অবস্তুতে, আর বিচিত্রতা না থাকিলে একত্ব যে শূন্যত্ব শুক্লত্ব

প্রভৃতির ন্যায় কেবল একটা ভাববাচ্যের পদে পরিণত হয়, একথা তখনও জানি নাই। সুতরাং খোদার উপর খোদকারি করিতে যাইয়া দুনিয়াটাকে একাকার করিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ মায়া এখন কাটিয়া গিয়াছে। দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই। সুতরাং দুনিয়ার ভাল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দুনিয়া-শুদ্ধ লোককে মন্দ বলিতেও আর প্রবৃত্তি হয় না।

এই ভাল-মন্দ জড়াইয়াই দুনিয়ার সত্য ভালটা গড়িয়া উঠে। পচাধষাটাকে কোনও দিনই বোধ হয় কেউ ভাল বলে না। অথচ বীজ প্রত্যক্ষতঃ যতক্ষণ না পচিতে আরম্ভ করে, ততক্ষণ তার অঙ্কুর-জাত হয় না। অদ্যকার মন্দ অনেক সময় কলাকার ভালরই অগ্র-দূত হইয়া আইসে। সকল সাধুরা এই কথা বলিয়াই ত জীবকে সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। আখেরী ভালর উপরে তাঁদের অটল আস্থা আছে; আমাদের নাই বলিয়াই আমরা পদে পদে এত বিচলিত হইয়া পড়ি।

আমাদের নিজেদের প্রকৃতির ভিতরে, আমাদের সমাজেরও প্রাণের মূলে, তার পক্ষে যাহা ভাল, আর দুনিয়ার পক্ষে যাহা ভাল, তাহা সকলই বীজাকারে লুকাইয়া আছে। এই ভালটাকে সংগ্রহ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বাহিরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এ কথাটা এক দিন জানি নাই ও বুঝি নাই বলিয়াই স্বদেশের দিকে পিছন ফিরিয়া বিদে-শের দিকে ছুটিয়াছিলাম। তবে ছুটিয়াছিলামও ভালরই জন্য। ঐ ভ্রান্তিটুকু না হইলে আজ যে সত্য লাভ করিয়াছি, তাহারও পরীক্ষা হইত না। আমাদের ভাল যে আমাদের ভিতরেই আছে, তাহাকে ভিতর হইতেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, বাহির হইতে মাগিয়া আনা নিষ্প্র-জন, ইহা বুঝিবার জন্যই বাহিরে গিয়া ভিতরের ভালটাকে একবার খুঁজিতে হয়। ইহা বিধাতারই বিধান। ঐ ভুল করিয়াছিলাম বলিয়াই এই সত্যটাকে আজ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি।

ইংরাজি পড়িয়া য়ুরোপের সভ্যতার রূপরসে মুগ্ধ হইয়া আমরা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা বিরোধ বাধাইয়া বাহিরে ছুটিয়া গিয়াই এই সত্যটা লাভ করিয়াছি বলিয়া, সেই বিরোধের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করি না। ঐটি না হইলে এইটিও হইত না। আজ আমরা একটা বৃহত্তর, উচ্চতর, গভীরতর সমন্বয়ের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ঐ বিরোধটা বাধাইয়াই এই সমন্বয়ের সন্ধান পাইয়াছি। আজিকার এই সমন্বয়ের পথে দাঁড়াইয়া, পূর্ব্বকার ঐ বিরোধকে জাগাইয়া রাখা বা চাগাইয়া তোলা যেমন অসঙ্গত ও অনিষ্টকর, সেইরূপ ঐ বিরোধ হইতেই যে এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথাটা ভুলিয়া যাওয়া বা অস্বীকার করাও অন্যায়। যারা আজিও ঐ পুরাতন বিরোধকেই সামান্য খুঁটিনাটি ধরিয়া জাগাইয়া রাখিতে চাহে, তারা যেমন এই সমন্বয়ের বাধা জন্মাইতেছে, অন্য দিকে যারা ঐ বিরোধটার মূল্য অস্বীকার করে, তারাও এই সমন্বয়ের প্রকৃত মর্ম্ম যে কি ইহা জানে না ও বোঝে না। ঐ বিরোধের মূল্য যে বোঝে না, এই সমন্বয়ের মর্য্যাদাই বা সে জানিবে কিসে?

সমন্বয় মাত্রেই, যে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই পূর্ণ দাবীদাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেয়। সুতরাং এই সমন্বয়মুখে পূর্ব্বে আমরা যে দিকে ছুটিয়া যাইতেছিলাম, তার কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনও সমন্বয়ই বিপরীত পথ ধরিয়া চলে না। গতির বেগটা একটু কমাইয়া বা তার মুখটা একটু ঘুরাইয়া দিলেও, প্রকৃত সমন্বয় মাত্রেই বস্তুকে তার মূল গন্তব্যের দিকেই বাড়াইয়া দেয়। সমন্বয় প্রত্যাবর্ত্তন নহে, অগ্রসর; প্রতিক্রিয়া নহে, বিকাশ। সমন্বয় মাত্রেই পূর্ব্বকার বিরোধের মূল লক্ষ্যকে সাধন করে, তাহাকে একেবারে নিরর্থক করিয়া দেয় না। মানুষের মন ও মানবসমাজ কেমন করিয়া যে বিকাশের পথে চলে, এইটী যাঁরা ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন না, তাঁরাই কেবল কার্পণ্যাভিভূত হইয়া এই

সমন্বয়-চেষ্টাকে প্রত্যাবর্ত্তন বা প্রতিক্রিয়া বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন।

তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানবসমাজ একটা সরল-রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না; আর ঘড়ির পেণ্ডুলাম্ বা পরিদোলকের মতনও একবার বামে আরবার দক্ষিণে দোল খায় না। কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততী যেমন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটার গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরেই, উপরে উঠিবার জন্যই, একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যক-গতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে,—ইহাকে স্পাইর‍্যাল মোষণ spiral motion বলে। সমাজ বিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইর‍্যাল, একান্ত সরল নহে। এ গতিতে ঠিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, একবার বামে ঝুঁকিয়া, আবার দক্ষিণে ছুটিয়া যাওয়ার মতন কোনও কিছু নাই। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার গতি, কিম্বা পরিদোলকের গতির জন্য একটা সমতল ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এইভাবে এক স্তর হইতে অন্যতর ও উচ্চতর স্তরে যাওয়া যায় না। আপনার গতি-বেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধ-মুখী তির্য্যক্‌গতির পথ অনুসরণ করিতে হয়। মানুষের মন ও মানুষের সমাজ যে ক্রমাগতই এরূপ এক স্তর ছাড়াইয়া অন্য স্তরে, এক ধাপ অতিক্রম করিয়া অন্যতর ও উচ্চতর ধাপে যাইতেছে, ইহা ত প্রত্যক্ষ কথা। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া শব্দে কোনও মতেই সত্যবস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

এই জন্যই বলি, বর্ত্তমানে আমরা যে সমন্বয়ের মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছি, তারই জন্য পূর্ব্বকার বিরোধটা অত্যাবশ্যক ছিল। এই সমন্বয়ের মুখে আমরা ফিরিয়া নহে, অগ্রসর হইয়াই আসিয়াছি। ঐ বিরোধের পূর্ব্বে আমাদের দেশের সভ্যতা ও সাধনা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, আজ তার চাইতে অনেক উচ্চ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার দেশ-ভক্তি বা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা এই সত্য কথাটা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না।

আজ দেশব্যাপী যে একটা সতেজ স্বাদেশিকভাব জাগিয়াছে, ইহা ত অস্বীকার করা যায় না। এই নূতন স্বাদেশিকতা যে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বাদেশিকতা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, তাই কি অস্বীকার করিতে পারি? আর এই যুগের প্রথমে আমরা বিদেশীয় ভাবের প্রেরণায় স্বদেশের সঙ্গে যে বিরোধটা বাধাইয়াছিলাম, তাহা যদি না বাধিত, তবে এই শ্রেষ্ঠতর স্বাদেশিকতার কোনই সন্ধান যে আমরা পাইতাম না, ইহাও অস্বীকার করা যায় কি?

আজ আমরা আমাদের স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনাকে অল্পে অল্পে প্রত্যক্ষভাবে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের অব্যবহিত-পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলাভ করেন নাই। যাহা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাকেই তাঁরা সত্য ও সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। দেশের রীতিনীতি, আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, এ সকলকে তাঁরা নিষ্ঠাপূর্ব্বক মাথায় করিয়া বহিয়াছেন; কিন্তু কোনও দিন বোধ হয় মাথা হইতে নামাইয়া নিজেদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন নাই। আর যে বস্তুকে কেবলই মাথায় করিয়া রাখা যায়, চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় না, তার যথার্থ জ্ঞানলাভ কদাপি সম্ভবে না।

বস্তুর তত্ত্ব-নিরূপণ ও উপলব্ধির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণকেই আমাদের দার্শনিক পরিভাষায় পরীক্ষা কহে। এই পরীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। আবার সন্দেহ ব্যতীত পরীক্ষার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় না। দরজার সামনে অন্ধকারে একটা লম্বা সরু বস্তু পড়িয়া আছে দেখিয়া, ইহা দড়ি না সাপ, এই সন্দেহ উপস্থিত হইলেই আলো আনিয়া

তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি। দড়ি বা সাপ এ দু'এর কোনও একটা ধারণা স্থির থাকিলে এ ব্যর্থশ্রম-স্বীকার কেহ করে না। অতএব পরীক্ষা ব্যতীত যেমন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না, সেইরূপ জিজ্ঞাসা ব্যতীত পরীক্ষারও সূত্রপাত হয় না। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে নিজেদের সভ্যতা ও সাধনা, আচার ও অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম ও কর্ম্মাদির প্রতি একটা কোমল শ্রদ্ধামাত্র ছিল, কোনও কোনও স্থলে একটা গভীর ভক্তি পর্য্যন্তও দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রযুক্তি না জানিয়াও কেবলমাত্র গতানুগতিক রীতিকে আশ্রয় করিয়া যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাকেই কোমল শ্রদ্ধা কহে। আমাদের শাস্ত্রে এই কোমল-শ্রদ্ধাবান লোকদিগকে নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়াছেন। তবে সাধন বলে

"ক্রমে ক্রমে তিঁহ ভক্ত হইবেন উত্তম—'

এই আশ্বাসও দিয়াছেন। আর জিজ্ঞাসাই এই উত্তম অধিকারলাভের পথে প্রথম অবস্থা। কিন্তু আমাদের অব্যবহিত-পূর্ব্বপুরুষদিগের এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। যাহা প্রচলিত তাহাই প্রামাণ্য, যাহা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সনাতন; তাঁরা এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করিতেন। এগুলি যে অসত্য বা সত্যাভাস, নিকৃষ্ট ও অধুনাতন হইতেও বা পারে, তখন পর্য্যন্ত কাহারো মনে এই সন্দেহের উদয় হয় নাই। সন্দেহ না জাগিলে জিজ্ঞাসার, জিজ্ঞাসা না জাগিলে পরীক্ষার প্রবৃত্তি হয় না। এই জিজ্ঞাসা ব্যতীত সত্যসন্ধিৎসা, সত্যসন্ধিৎসা ব্যতীত সাধনে একাগ্রতাও জন্মে না। একাগ্রতা না জন্মিলে ত্যাগের শক্তি জাগে না। ত্যাগের শক্তি না জাগিলে সংস্কারবর্জ্জনের সাহস, আর সংস্কারবর্জ্জন না করিলে সম্যক বিচারের অধিকার, এবং বিচার ব্যতীত কদাপি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ইংরাজি শিখিয়া, য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ইতিহাসাদির পুথি-গত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া, আমাদের নিজেদের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পাদি সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এখানে নিজেদের ঘরে যাহা দেখিতেছিলাম, ওখানে ঐ সকল গ্রন্থে আর সাহেবদের আচার-

আচরণে তার বিপরীত সব দেখিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রের অর্থ তখন কেহ আমাদিগকে কহেন নাই; কহিবার মতন লোকও দেশে বেশী ছিলেন কি না সন্দেহ। উহাদের শাস্ত্রসাহিত্যের মর্ম্ম আমাদের চক্ষের সম্মুখেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উহাদের ভাব ও আদর্শ যে কি ইহা আমরা স্বল্পবিস্তর বুঝিতে পরিতাম; আমাদের রীতিনীতির মর্ম্ম যে কি, ইহা কিছুই বুঝিতাম না। উহাদের বাহিরের শিক্ষা আমাদের সকল বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিত; আর আমাদের ঘরের শাসন কেবলই চারিদিকে আমাদিগকে কষিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিত। এক দিকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, অপরদিকে কঠোর আনুগত্য। একদিকে ভোগ, অপর দিকে ত্যাগ। এক দিকে প্রত্যক্ষ রূপরসাদি, অপর দিকে অপ্রত্যক্ষ স্বর্গমোক্ষ। এক দিকে প্রবৃত্তির মোলায়েম প্ররোচনা, অপর দিকে নিবৃত্তির নির্ম্মম শাসন। এই দুই শক্তির মাঝখানে পড়িয়া আমরা যে যৌবনের সহজটানে আমাদের ঘরের বাঁধন কাটিয়া ঐ বাহিরের মুক্তির সন্ধানে ছুটিলাম, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কারণ, ঐ স্বাধীনতাই যৌবনের স্ব-ধর্ম্ম। বিধির বিধানেই মানুষ যৌবনের প্রেরণায় বহির্বিষয়ের রূপরসের মাঝে আপনার ভিতরকার সার্থকতা খুঁজিয়া থাকে। আমাদের নিজেদের সভ্যতায় ও সমাজে এই সহজ যৌবন-ধর্ম্মের উপযোগী সাধন সে সময়ে একপ্রকার লোপই পাইয়াছিল। যুবা বৃদ্ধ সকলে একই বিধি-নিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, আশ্রমবিহীন হইয়া, কেবলমাত্র বর্ণভেদে পরিণত হইয়াছিল। কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য, যৌবনে গার্হস্থ্য, প্রৌঢ়ে বানপ্রস্থ, বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস,—এসকলের কোনও কিছু ছিল না; ছিল কেবল বিধি-নিগড়বদ্ধ গার্হস্থ্য, আর অস্বাভাবিক মর্কট বৈরাগ্য ও উচ্ছৃঙ্খল সহজীয়া সন্ন্যাস। শাস্ত্র ছিল, তার অর্থ কেহ জানিত না; আচার ছিল, তার বিচার কেহ করিত না। ধর্ম্ম ছিল, তার মর্ম্ম কেহ বুঝিত না। সমাজ একদিকে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষণ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত কাম্যকর্ম্মজাল,

পূজা-অর্চ্চনার সংকল্প ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া—"রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"—বলিয়া সকল সংসার-কামনাকে প্রদীপ্ত করিয়া দিত।

আমরা যে আকস্মিক উল্কাপাতের মতন পূর্ব্বাপর সম্পর্কশূন্য হইয়া আকাশ হইতে এদেশের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা নহে। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দোষগুণের বোঝা মাথায় লইয়া তাঁহাদের কর্ম্মভারক্ষয় করিবার জন্যই এদেশে আসিয়া জন্মিলাম। ঐ বিধির বাঁধনের ভিতরেই এবং ঐ সমাজশাসন সত্বেও, তাঁহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে যে সকল কামনা ও বাসনা শুষ্ক-নির্ঝরগর্ভে গুপ্ত-ফোয়ারার মতন দিবানিশি স্ফুরিত হইত তাহাই আমাদের এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণায় বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তাঁরা যাহা চাহিতেন, কিন্তু পাইতেন না; যে বন্ধনের ক্লেশই তাঁরা অনুভব করিতেন, কিন্তু তাহাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া মুক্ত হইবার মতন শক্তি ও সাহস তাঁদের ছিল না; আমরা এই নব-শিক্ষায় নূতন শৌর্য্য অর্জ্জন করিয়া সেই বস্তুর পশ্চাতে প্রকাশ্যে ছুটিয়া গেলাম এবং অবলীলাক্রমে সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনাদের যৌবনকে সার্থক করিতে লাগিলাম। যে শক্তির সাহায্যে আমরা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার বন্ধনকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম, সে শক্তিও মূলে আমাদেরই দেশের, বিদেশের নহে। ইহাকে স্বাধীনতাই বলি, আর স্বেচ্ছাচারই বলি, যাই বলি না কেন, ইহার উদ্দীপনা মাত্র কেবল বিদেশের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে আসিয়াছিল, মূলে শক্তিটা স্বদেশেরই সভ্যতা ও সাধনার। পূর্ব্বপুরুষদিগের যে বাসনা চরিতার্থ হয় নাই, তাহাই এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের জীবনে নিজ নিজ চরিতার্থতা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোনও শিক্ষাদীক্ষাতেই মূল রক্তের বাঁধনটা নষ্ট করিতে পারে না। সুতরাং আমরা এই বিদ্রোহের মুখেও স্বদেশের ভিতরকার প্রাণস্রোত হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারিলাম না। এই যোগটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলে আজিকার এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা

পর্য্যন্ত থাকিত না। সমন্বয় বিরোধের নিষ্পত্তি করে, সামাজিক-সমন্বয় সমাজগতিকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই পরিবর্ত্তিত আধার ও আবেষ্টনের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া দেয়। সমন্বয় পুরাতনকে পূর্ণ করে, বিনাশ করে না ; নূতনকে সার্থক করে, সংহার করে না।

এই সমন্বয়-পন্থাকে অনুসরণ করিয়াই আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকল মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্ম্মমীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা এবং ব্রহ্ম-মীমাংসা বা উত্তরমীমাংসা, উভয় দর্শনই এই সমন্বয়ের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। উভয়েই প্রথমে শাস্ত্র মানিয়া লইয়াছেন, শাস্ত্রের স্বতঃ প্রমাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। সকল বিজ্ঞানই এইরূপে আপনার মূল তত্ত্বগুলিকে মানিয়া লয়। গণিত দেশকালের অস্তিত্ব, আর এই দেশ কালের যে একদিকে অন্ত নাই ও অন্যদিকে এরা অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে—এই তত্ত্বগুলি মানিয়া লইয়া তবে আপনার যাবতীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। গণিতের সকল বিচার ও যুক্তি এই কয়টা তত্ত্বকে মানিয়া লইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছে। জড়বিজ্ঞান সেইরূপ জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও যাহাকে আমরা সচরাচর জড়ের গুণ বা ধর্ম্ম বলি, তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লই-যাই আপনার সর্ব্বপ্রকারের বিচার-পরীক্ষায়, গণনা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ আমাদের মীমাংসাদর্শনও শাস্ত্র যে স্বতঃ প্রামাণ্য এইটি মানিয়া লইয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা বেদের কর্ম্মকাণ্ড-কেই, আর উত্তরমীমাংসা তাহার জ্ঞানকাণ্ডকেই, একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিচারযুক্তি প্রয়োগে নিজ নিজ বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাস্ত্র উভয়েরই মূল। তাহারপর, এই শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার বা সন্দেহের উৎপত্তি। এই জিজ্ঞাসাই মীমাংসার প্রয়োজন প্রমাণ করে। এইজন্য এই জিজ্ঞাসাই উভয় মীমাংসার প্রথম ও আদি কথা। পূর্ব্বমীমাংসা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা," আর উত্তরমীমাংসা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—বলিয়াই আপনাদের দর্শনের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম কি, আর ধর্ম্ম নয় কি : ব্রহ্ম

কি, আর ব্রহ্ম কি নয়; এই বিষয়ে সন্দেহই এই জিজ্ঞাসার মর্ম্ম। এই সন্দেহ হইতে বিচার। এই বিচার হইতে সঙ্গতি। আর এই সঙ্গতির পরে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

শাস্ত্র;
|
সন্দেহ;
|
বিচার;
|
সঙ্গতি;
|
সমন্বয়

—এই পাঁচ পায়ের উপরে আমাদের ধর্ম্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামাজিক জীবনের অভিব্যক্তিতেও এই ধারাই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে যদি সমাজের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধানাদিকে বসাইয়া দেই, তাহা হইলে—

যাহা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত,
|
তাহার সত্যতা বা সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ,
|
সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচার,
|
এই বিচারের ফলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের
পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি,
|
আর সর্ব্বশেষে, এ সকল বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের
সঙ্গে সার্ব্বভৌমিক যে বিশ্ব-সমস্যা
তাহার যথাযোগ্য সমন্বয়—

এই পঞ্চ অঙ্কে সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির ক্রমও ঠিক প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সমাজ-জীবনের বিকাশের ভিতরেও যে চৈতন্যের বা জ্ঞানের লীলা রহিয়াছে, ইহা মানিয়া লইলে এই পঞ্চ

পদের অনুক্রমণ করিয়াই যে সমাজের ধারা রক্ষিত ও বিকশিত হয়, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ ইহাই জ্ঞানের সার্ব্বজনীন ক্রম। জড়বিদ্যা, জীববিদ্যা, সকলেরই এই একই পন্থা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া, জ্ঞানেতেই স্থিতি করিতেছে বলিয়া, বিশ্বের গতি এবং অভিব্যক্তি এই জ্ঞানের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই চলে।

যাহা আছে, তাহাতে মানুষের চিরদিন কুলায় না। বাহিরে যাহা ব্যক্ত হয়, ভিতরে তার চাইতে ঢের বেশী অব্যক্ত থাকিয়া যায়। অভিব্যক্তির ধর্ম্মই ইহা। চিত্রকর যখন চিত্র আঁকেন, তখন তাঁর মনে যে রূপটা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি চিত্রপটে যতটা ফুটাইয়া তুলেন, তাঁর নিজের চিত্তপটে তার চাইতে অনেক বেশী অপ্রকট থাকিয়া যায়। সমগ্র ছবিটা আঁকা শেষ হইলেও, তাঁর মনটা ফাঁকা হইয়া গিয়াই, যাহা আঁকা হইয়াছে তার চাইতে আরো বড় কি একটা যেন আঁধারে পড়িয়া আছে, এই ভাবে উদাস-পারা হইয়া উঠে। কবি, গায়ক,—সৃষ্টি যাঁরাই করেন, তাঁদেরই এই অভিজ্ঞতালাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানের, প্রেমের, কর্ম্মের, সকল অভিজ্ঞতার ভিতরেই এই ব্যক্ত ও অব্যক্তের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অব্যক্তের সর্ব্ববিধ অভিব্যক্তিই মন্বন্তর এই ক্রমটার অনুসরণ করিয়া চলে।

এই ভাবেই বিশ্বের অভিব্যক্তি হইতেছে। ইংরেজিতে এই ক্রমটাকে—Thesis, Antethesis, Synthesis বলে। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ইহাকে—তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক—এই ভাবে কতকটা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। স্থিতির অবস্থাই জিনিসের

(Thesis) অবস্থা। স্থিতিতে গতিবেগ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহা একরূপ অসাড় অবস্থা। অসাড়তা তমের প্রধান ধর্ম্ম। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার তম প্রলয়ের ধর্ম্ম। নিদ্রা ইহার লক্ষণ। আর প্রলয়-কালে বিধাতা যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া কারণ-জলে শয়ন করিয়া রহেন, পুরাণে এই কাহিনী আছে। সুতরাং স্থিতি, থিসিস, আর তম, এই তিনই সমধর্ম্মাপন্ন। তার পর বিরোধ বা অ্যান্টিথিসিস্ বা রাজসিক অবস্থা। এই অবস্থাতেই ভেদ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর সমন্বয়ে, সিনথেসিসে, বা সাত্ত্বিক ভাবেতে সকল ভেদবিরোধের মীমাংসা হইয়া, সত্যের আপাত-পূর্ণতম রূপ প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই অবস্থাই আবার ক্রমে স্থিতিতে বা থিসিসে বা তমেতে যাইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সমন্বয় পরবর্ত্তী যুগের স্থিতি, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সিনথেসিস পরবর্ত্তী যুগের থিসিস, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সত্ত্ব পরবর্ত্তী যুগে তম হইয়া পড়ে। তখন আবার বিকাশগতিকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বিরোধ, অ্যান্টি-থিসিস্ বা রাজসিকতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিরোধ বিশ্বের প্রকৃতির মূল কথা নহে। বিরোধেতে এ সংসারে কোনও কিছু বেশী-ক্ষণ স্থিতি করিতে পারে না। তাই বিরোধটা পাকিয়া উঠিলেই সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়;—অ্যান্টিথিসিস পূরা হইলেই সিনথেসিস্, আর রাজসিকতা প্রবল হইলেই সত্ত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ এই ক্রম অনুসরণ করিয়া বিশ্ব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের এই "সনাতন" হিন্দুসমাজের জীবনেও এই সার্ব্বজনীন বিকাশ-ক্রমের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমরাও এক দিন বর্ব্বর ছিলাম। ক্রমে সেই শৈশবের বর্ব্বরতা হইতেই বর্ত্তমানের সভ্যতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই দীর্ঘপথ হাঁটিতে অনেক যুগযুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে। তম হইতে রজঃ, রজঃ হইতে সত্ত্ব; স্থিতি হইতে বিরোধ বিরোধ হইতে সমন্বয়, থিসিস হইতে অ্যান্টিথিসিস, অ্যান্টিথিসিস হইতে

সিন্থেসিস,—বারম্বার এইরূপ করিয়া আমরাও ফুটিয়া উঠিয়াছি। যুগে যুগে আমরা নূতন জ্ঞান, নূতন শক্তি, নূতন প্রীতি, নূতন কর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছি। হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা বহুকাল পূর্ব্বে যে পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল, তাহাই এতাবৎকাল চলিয়া আসিয়াছে, তার অপচয় বা সঞ্চয় আর কিছুই হয় নাই, একথা যে বলে, সে হিন্দুর ইতিহাস জানে না, হিন্দুর শাস্ত্র বুঝে না, হিন্দুর দর্শনের ক খ'এর জ্ঞান পর্য্যন্ত তার জন্মায় নাই। হিন্দু চিরদিনই মুক্তভাবে চলিতে চাহিয়াছে। এই মুক্তির জন্যই সে নিজেকে কতবার কত বাঁধনে জড়াইয়াছে, আবার এই বন্ধনের দ্বারা এই মুক্তিলাভ হইল না দেখিয়া নির্ম্মম ভাবে সকল বিধিনিষেধকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। এই কথাটা বুঝিলেই হিন্দু যে কোনও দিন অচলায়তন রচনা করিয়া তার ভিতরে বেশীদিন আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, এটা সুস্পষ্ট-রূপে বুঝা যায়। যুগে যুগে হিন্দু, যুগপ্রয়োজনকে অঙ্গীকার করিয়া, নূতন নূতন ধর্ম্মের, নূতন নূতন কর্ম্মের, নূতন নূতন বিধিনিষেধের, নূতন নূতন শাস্ত্র সংহিতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যথা পূর্ব্বং তথা-পরং। যুগে যুগে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এই যুগেই কি কেবল তার ব্যতিক্রম হইবে?

ব্যতিক্রম যে হয় নাই, পরমহংস রামকৃষ্ণ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ, ইহাঁরাই তার সাক্ষী।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মৃণালের কথা।

১।

ভগিনীর পত্র।

মেজ দাদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম। তুমি ভাবিও না। আমি তারে বেশই চিনি, তোমার চাইতে বোধ হয় বেশীই চিনি। দিন কতক যদি তারে না ঘাঁটাও, সে আপনি ফিরে আসবে।

লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের নয়। তুমি রাগ ক'রো না, তার বিদ্যা কত, আমরা ত জানি। দেখ্‌ছো না কি, যে সব বইএর কথা গেঁথে গেঁথে মেজ'বউ এই চিঠিটা সাজিয়েছে। আমি ভাব্‌ছি সে অমন চিঠিটা তোমায় পাঠালে কেন? তা না করে', কোন ভাল মাসিক কাগজে পাঠিয়ে দিলে তার লেখার তারিফ বেরোত', কালে জানি কি একজন বড় লিখিয়ে বলে লোকে তাকে জানত। আমার দুঃখু হয়, আমরা দুই ভাই-বোন আর উনি ছাড়া অমন একটা বড় লেখা বাংলার সমজদার পাঠকেরা কেউ পড়্‌লে না।

আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজ'বউর লেখা কি না। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে ত তুমি বেশ জান। শুনছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠ্‌ছে। শুঁড়-ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে, আর কবিদের মতন বাব্‌রী চুল রেখেছে। শুনেছি রবিঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। তাঁর নামসহি ছবি পর্য্যন্ত বাক্সে আছে, বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে বেড়ায়। সেই হয়তো এ চিঠিটা লিখে দিয়েছে।

লেখার খুব বাহাদুরি আছে, উনি পড়ে বল্লেন যে ঠিক যেন রবি ঠাকুরেরই মতন। তুমি জান কি? মেজ' বউই আমায় লিখেছিল যে, "সঞ্জীবনীতে" স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা নাকি এই ছোঁড়াটারই লেখা, স্নেহলতার নাম জাল করে ছাপিয়েছে। আমাদেরো পড়েই তাই মনে হয়েছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে, যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখ্‌তে পারে না।

দেখ্‌ছো না, মেজ'বউএর চিঠিও ঐ ছাঁচেই ঢালা। আমরাও ত তোমাদের কল্যাণে একটু আধটু বাংলা শিখেছি, কিন্তু অত বড় বড় কথা ত কৈ জুটাতে পারি না। আর অত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা! উনি বল্লেন আগা গোঁড়া যেন ইরেজির তর্জ্জমা। মৃণাল কবিতাই লিখুক আর যাই করুক, ইংরেজিও পড়েনি, বিলেত টিলেতও যায় নি। সে অমন ইংরেজি ঝাঁঝের বাংলা লিখ্‌তে শিখ্‌লে কেমন করে, উনি কিছুতেই ঠাওর কর্ত্তে পাল্লেন না। আমি মুখ্‌খু মানুষ, কি আর বল্‌'ব?

তুমি বল'বে, ইংরেজি হো'ক, বাংলা হো'ক, লেখাটা ত মৃণালের; ভাষাটা যারই হো'ক না কেন, মনের ভাবটা ত তার নিজের! আমি বলি, তাও নয়। ভাষা, ভাব, সব ধার করা, নাটুকে জিনিষ। দেখ্‌ছ না, ও কোথায়, কোন্ নাটকে, কি কোন্ গানে, মীরা বাই'এর কথা পড়েছে, আর অম্‌নি ভাব্‌ছে যে, সে মীরা বাই হয়েছে। উনি বল্লেন, ভক্তমালের যখন আবার নতুন সংকরণ হবে, তখন মেজ'বউএর কোনও কবি-ভক্ত নিশ্চয়ই, মীরা বাইএর কথার পরে, তার কথাটাও বসিয়ে দেবে। এ চিঠিতে তারই আয়োজন হচ্ছে। তামাসা কচ্ছেন না, সত্যি হতে পারে। তবে তুমি মাঝখানে পড়ে বাগড়া দেবে, ওঁর ঐ যা ভয়।

উনি বল্লেন এ চিঠিটা আর কিছু নয়, কেবল হিষ্টিরিয়া। ওঁদের ডাক্তারী কেতাবে না কি লেখে হিষ্টিরিয়াতে এ সব হয়। এমন কি, অমন যে রক্তমাংশের মানুষের পীঠটা, তাও নাকি একেবারে

কাচের হয়ে যায়। উনি বলেছিলেন যে ডাক্তারী বইএতে নাকি এ ধরণের একটা মেয়ের কথা আছে। তার বিশ্বাস হয়েছিল যে, তার পীঠটা কাচের হয়ে গেছে। তামাসা করে একজন তার পীঠে একটা চাপড় মারাতে, "পীঠ গুঁড়ো হয়ে গেল" বলে চীৎকার করে সে মেয়েটা তখনি মারা যায়। হিষ্টিরিয়াতে এতটা নাকি হয়। মেজ'বউএর এও এক রকমের হিষ্টিরিয়া। তার খেয়াল হয়েছে যে সে কারার বন্দিনী, আমাদের বাড়ীটা একটা জঘন্য জেলখানা, তোমরা সবাই কারারক্ষক। আমাদের বাড়ীর উঠানটা ত নেহাৎ ছোট নয়,—আমার শাশুড়ী তোমার বে'র সময় গিয়ে ঐ উঠান দেখে আশ্চার্য্য হয়ে গেছলেন,—পাড়াগাঁয়েও অমন দৌড়দার উঠান কম, কলকাতার ত কথাই নাই। কিন্তু এত বড় উঠানটা মেজ'বউএর চোখে কত ছোট ঠেকছে! আমাদের ঘরগুলো কেমন বড় বড়, উত্তরদক্ষিণ খোলা, সাহেবদের ঘরের মতন অমন সাজান না হলেও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেজে গুলো আয়নার মতন চক্ চক্ ক'চ্ছে। আর বড় বৌএর যে শুচি বাই, রাতদিনই ত কেবল জল ঢাল্‌ছেন, আর দুটো ঝির পেছুনে পেছুনে ঘুরে ঘষাচ্ছেন ও মাজাচ্ছেন, এমন সাফশুক্‌ঁ ঘরদোর সকলের বাড়ীতে দেখা যায় না। কিন্তু অমন ঘরেও মেজ'বউএর মন উঠে না। কিন্তু মেজ'বউ-এর কোনও দোষ নাই। মেজ'বউ ত আর চোখ দিয়ে কোনও জিনিষ দেখে না। তার খেয়ালে যখন যেটা যেমন ঠেকে সেটাকে তেম্নি দেখে। উনি বলেছিলেন যে সব কবি আর ঋষিদেরই নাকি ঐ রকম স্বভাব।

এক দিনের কথা তোমায় বলি; এ কথাটা নিয়ে আমরা কত দিন হেসে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি। সে বারে আমি পূজার সময় তোমাদের ওখানে ছিলাম। তুমি ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে। তখন বছর পাঁচ ছয় বোধ হয় মেজ'বউএর বে' হয়েছে। আমি মেজ'বউএর ঘরেই শুতাম। একদিন, ঘোর আঁধার রাত,

আকাশে ঘন মেঘ, বাহিরে গিয়ে হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। অনেক রাত অবধি আমি বড়বউএর কাছে বসে গল্পগাছা কচ্ছিলাম। শু'তে গিয়ে দেখি, মেজ'বউ জানালার পাশে বসে ঐ অন্ধকার পানে তাকিয়ে আছে। বল্লাম "রাত অনেক হয়েছে, মেজ'বউ শু'তে এসো।" মেজ'বউ আমায় বল্লে কি জান?— "ঠাকুর ঝি, দেখ এসে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। ঐ আমবাগানে যেন রূপো গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে, আকাশে যেন রূপালী রং মাখিয়ে তার নীলবরণকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। মরি, মরি, কি সুন্দর।"

আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, বল্লাম "বলিস্‌ কি মেজ'বউ? এ যে ঘোর আঁধার রাত। কাল বাদে পরশু কালীপূজা। চাঁদ পেলি কোথায়?' তোর অত রসের ঢেউ আজ উঠ্‌ল কিসে?"

মেজ'বউ একেবারে চটে উঠে বল্লে "ঠাকুর ঝি, তোমার আক্কেল কেমন? অমন ত্রিদিববন্দ্য চন্দ্রমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কচ্ছো? না তোমার চোখের মাথা খেয়েছ?"

আলোটা একটু উস্কিয়ে দিযে কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম মেজ'বউএর চোখের ভাবটা সহজ মানুষের মতন নয়। প্রাণ শুকিয়ে গেল। তবে কি শেষে পাগল হ'লো! হঠাৎ তার বিছানার দিকে চেয়ে দেখি, মেজ'বউ এক নতুন কবিতা লিখেছে—

চাঁদনি রজনী, আও-লো সজনি,
চাহলো নয়ান মেলি।
আম্র কানন, মর্ম্ম মন্থন
নর্ম্ম পরাণ কেলি।
শুভ্র উজল, অভ্র কাজল
উছল ভুবন ভরি।
মঞ্জীর মুকুরে, শিঞ্জিত নুপুরে
রঞ্জল কিবা মরি!

তখন আমার ঐ ডাক্তরী বইএর কথা মনে পড়্লো। ভাব্লাম এ খেয়ালটা তার যেমন আছে থা'ক। জোর করে ভাঙাতে গেলে হয় ত উল্টা উৎপত্তি হবে। তাই ভেবে বল্লাম—

"তাই ত মেজ'বউ, আমার কি ভ্রমই হয়েছিল? সত্যই ত বড় সুন্দর চাঁদনি রাত। তবে জানই ত, উনি কালীপূজার সময় আমায় নিয়ে যেতে আস্বেন, তাই ভেবে ভেবে কালই বুঝি অমাবস্যা তাই মনে হচ্ছিল। আমি বিরহে অন্ধ হয়ে গেছিলুম, তাই অমন জোছনা রাতও চোখে আঁধার ঠেক্‌ছিল।"

মেজ'বউএর মুখখানি অমনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। জানালা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে, আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরে বল্লে,—

"ঠাকুর-ঝি, তুমি তবে প্রেম তা' কি জান? আমি ভাবতাম তুমি কেবল রান্নাবান্নাই কর, আর স্বামিপুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে এ দাসীত্বেই অমন নারীজন্মটা খোয়াচ্ছো। বাঙ্গালীর মেয়ে খাঁচার পাখী, তারা কি বনের পাখীর সুর কখনও ভাঁজতে পারে? কেবল বাঁধা-বুলিই ত কপ্‌চায়, দেখি! বনের গান একেবারে ভুলে গেছে। হায়! বনের পাখী হলাম না কেন?"

আমি কি আর বলব? তামাসা করে বল্লাম—

"তোর চকা তো এখন আকাশে উড়ছে; বাসায় ফিরে এলে বলিস্, তোরে উড়িয়ে নিয়ে বনে যাবে।"

এই চিঠি পড়ে আমার সেই কথা মনে পড়্‌ল। এও তার খেয়াল। কবিতাগুলো কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে, না সত্যিই পুড়িয়ে ফেলেছে? ও জিনিষ পুড়ান যায় না। দেখ দেখি, কোথাও রেখে গেছে কি না? যদি রেখে গিয়ে থাকে, তবে খুঁজে দেখ, ঐ কৃষ্ণ-পক্ষের জোছনার বর্ণনার মতন বিন্দির সম্বন্ধেও অবশ্য দু-দশটা কবিতা পাবে।

তুমি ত তাকে জান। পনর বছর তাকে নিয়ে ঘর করছ। সে যে তোমায় ছেড়ে বেশি দিন ঐ নীল-সমুদ্র আর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ

নিয়ে থাক্‌তে পারবে তা ভেব'না। সত্যি জিনিষে তার মন উঠে না। ছেলেবেলা থেকে সে তাই ছোট যা তাকেই বড়, আর বড় যা তাকেই ছোট করে ভেবেছে। তোমার বাড়ী থেকে তোমার শ্বশুর বাড়ী কত দূর তুমি জান। শ্যামপুকুর আর টালা [illegible] দিনের পথ নয়। সেকেনক্লাস গাড়ীতে আধ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ী অত কাছাকাছি এটা ভাব্‌তে মেজ'বউএর ভাল লাগ্‌ত না। তোমারই মুখে শুনেছি, তাই সে কোনও দিন সোজা সুজি বাপের বাড়ী যাতায়াত করে নি। শিয়ালদ'এ রেলে চেপে দমদমা গিয়ে নেমেছে, সেখান হ'তে ছ্যাকড়া গাড়ীতে টালায় গিয়েছে। একবার—তোমার মনে আছে কি?—সেবারে বর্ষাকালে আমি তোমাদের দেখ্‌তে যাই। মে'জ বউএর ভাইপোর ভাত। কিন্তু সে কিছুতেই গাড়ীতে বাপের বাড়ী যাবে না। শিয়ালদ'এ রেলে চেপেও যাবে না। বল্লে—বর্ষাকালে বধূরা নৌকায় বাপের বাড়ী যায়, সব কেতাবে লেখে। গাড়ীতে বরষার অভিসার কোনও কালে কেউ লেখে নাই। যদি যাই, ত নৌকায় যাব। এক রাত নৌকায় শোব। চড়ায় নৌকা লাগিয়ে ভাত রেঁধে খাব। মাঝিগুলো ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দাঁড় টানবে আর ভাটিয়াল গাইবে। কোট করে বস্‌ল। কি কর, তুমিও তা'তেই রাজী হলে। শোভাবাজারে গিয়ে সন্ধ্যা বেলা নৌকায় উঠলে, বাগবাজারে এসে রাত্রে রান্নাবান্না কল্লে, পরের দিন প্রাতে শ্যামবাজারের পোলের কাছে নৌকা লাগিয়ে, পাল্কী করে তাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী গেলে! এ সকল জেনে শুনেও তুমি অমন অস্থির হয়েছ কেন?

আমাকে পুরী যেতে বল্‌ছ, আমি এক্ষুণি যেতাম। কটক থেকে পুরী তেমন দূরেও নয়; কিন্তু গেলে উল্টা ফল হবে। আমি আমার ঠাকুরপোকে পাঠাচ্ছি সে মেজ'বউকে চোখে চোখে রাখ্‌বে, আর প্রতিদিন আমাকে খবর দিবে। উনি তা'কে একটা খাতা করে দিয়েছেন। 'বল্লেন তুই সর্ব্বদা সঙ্গে থাক্‌বি আর

এই খাতায় ডায়রী রাখ্‌বি। আর রাত্রে ডায়রীটার নকল পাঠাবি।'

মেজদাদা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমরা থাক্‌তে মেজ'বউএর কোনও বিপদ ঘটবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঠাকুর পো'র পত্র।

১।

বউ দিদি,

এই তিন দিন তোমাকে কোনও খবর দেই নাই; খবর দিবার কিছু ছিল না। তোমার মেজ'বউ যে বাড়ীতে ছিলেন, আমি এসে দেখ'লাম সেখানে নাই। সে এক পাণ্ডার বাড়ী। কোথায় যে উঠে গেছেন, তাও সে কথা বল্‌তে পারলে না।

তোমার যে খুড়িমার সঙ্গে তোমার মেজ'বউ পুরী এসেছিলেন, এখন তিনি দেশে ফিরে গেছেন। তোমার মেজ'বউকে যাবার জন্য শুনলাম অনেক পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হন নি। ওদিকে তাঁর পৌত্রটীর বড় অসুখ, খবর পেয়ে বেচারী আর থাক্‌তে পারলেন না। তোমার মেজবউ তাঁর ভাইকে নিয়ে সেই পাণ্ডার বাড়ীতেই রয়ে গেলেন, বল্লেন যখন জগন্নাথ এনেছেন, তখন রথযাত্রা না দেখে যাব না। তোমার খুড়িমা চলে গেলে, পরের দিনই তোমার মেজ'বউ সে পাণ্ডার বাড়ী থেকে কোথায় উঠে গেছেন, তারা কেউ জানে না। তবে বল্লে, স্বর্গদ্বারে নাকি একটা বাড়ী ভাড়া করেছেন।

তোমার মেজ'বউকে যদি আমি জানতাম বা তাঁর ভাইএর নামটাও যদি বলে দিতে, তা হলে স্বর্গদ্বারে গিয়ে খুঁজে বের করা কিছুতেই কঠিন হ'ত না। কিন্তু আমি ত তাঁকেও দেখিনি, তাঁর ভাইএর নামও তুমি বল নাই। তোমার দাদার নাম করে খোঁজ করতে পারতাম। কিন্তু তাতে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি হত, তোমরা আমাকে যে গোয়েন্দাগিরি কত্তে পাঠিয়েছ তাহা হত না। কাজেই সেটা করি নাই। ঘটনাক্রমে কোনও সন্ধান করতে পারি কি না, তাই দেখে দেখে কেবল স্বর্গদ্বারের পথে ঘাটে এই কটা দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমার আশীর্ব্বাদে সন্ধান পেয়েছি। আমার বাহাদুরী কিছুই নাই। কেবল ঘটনাচক্রেই এটা ঘটেছে।

আজ সন্ধ্যাবলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটী পরিচিত ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। কল্‌কাতায় যখন আমি Y. M. C. A. এর বোর্ডিংএ ছিলাম। তখন আমরা দুজনে একই ঘরে থাক্‌তাম। সে আজ তিন চার বছরের কথা। হঠাৎ আজ তাকে এখানে দেখ্‌তে পেলাম। বল্লে সে তার দিদির সঙ্গে স্বর্গদ্বারে আছে। সে আমায় কিছুতেই ছাড়্‌লে না—তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। তার ঘরে ঢুকে দেখি একটা বিলাতী ট্রাঙ্কের উপরে তোমার দাদার নাম লেখা। বুঝ্‌লাম বিধি আজ সুপ্রসন্ন হয়েছেন। যা খুঁজ-ছিলাম, তাই আপনি মিলিয়ে দিয়েছেন। সে আমায় কিছুতেই রাত্রে না খাইয়ে ছাড়লে না। তোমার মেজ'বউএর সঙ্গেও দেখা হল, সে'ই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তুমি যে আমার বউদিদি এরা কেউ জানে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমে ক্রমে সব খবর পাবে এখন। তবে তোমরা যে প্রতিদিন একটা ডায়রী পাঠাতে বলেছ, তা কি দর-কার? যে দিন কিছু বিশেষ বলবার থাকে সে দিনই চিঠি লিখ্‌ব। আর পুরীতে যারা হাওয়া খেতে আসে, তাদের ডায়েরী কিরূপ হবে, তা তুমিই জান। প্রাতে চা' পান। তারপর সমুদ্রের ধারে

ভ্রমণ। তারপর গৃহে প্রত্যাগমন। নয়টার সময় মুনিয়ার আগমন। সাড়ে ৯টা হইতে ১১টা সমুদ্রে স্নান ও মুনিয়ার হাত ধরিয়া ঢেউ খাওয়া ও সাঁতার কাটবার ভান করা। ১১॥০টায় আহার। ৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা। ৪টায় চাপান বা জলখাবার। ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ান। রাত্রে আহার ও তারপর শয়ন। তোমার মেজ'বউএর ডায়রীও ঠিক এই। এটা আমি তাঁর ভাইএর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বে'র করে নিয়েছি। সুতরাং প্রতিদিন এইরূপেই কাটছে, জানিয়া রাখিও। প্রতি রাত্রে পুরাতন কথা লিখে বেহুদা কাগজ ও কালি খরচ করার কোনও প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে, লিখিও, হুকুম তামিল করব। এখন ধর্ম্মাবতারকে সেলাম করিয়া এ অধীনের তরে শয্যাশায়ী হইতে আজ্ঞা হয়।

২।

বউ দিদি,

আজ একটা নূতন খবর আছে। শুনে তুমি খুসী হবে। তোমাদের খরচ বাঁচল। আমি ভিক্টোরিয়া হোটেল ছেড়ে চলে এসেছি। শরৎ (তোমার মেজ'বউএর ভাইএর নাম শরৎ) ক'দিনই আমাকে তাদের সঙ্গে এসে থাকতে পীড়াপীড়ি কচ্ছিল। আমি কিছুতেই রাজি হই নি। ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু নিজেকে অত সস্তা করাটা কিছু নয়, তুমি দাদাকে সর্ব্বদা এই কথা বল। তাই আমিও নিজেকে সস্তা করতে চাই নি। যা হউক কাল রাত্রে, তোমার মেজবউও বড় ধরে বসলেন। তিনি আমাকে নরেন বলেই ডাকেন, আর আমিও তাঁকে দিদি বলতে আরম্ভ করেছি। তাঁর অনুরোধ আর এড়াতে পারলাম না। তোমাদের কাজের অনুরোধেও এ আতিথ্যগ্রহণ করাই ভাল মনে কল্লাম। তোমার মেজ'দাদাকে লিখ, আমি তাঁর গিন্নিকে পাহারা দিচ্ছি। গোয়েন্দাগিরিটা জমছে ভাল।

আচ্ছা, বউ দিদি, তোমরা তোমাদের মেজ'বউএর উপরে অমন নারাজ কেন? আমার ত তাঁকে বেশ ভালই লাগে। ভাল'র চাইতেও ভাল লাগে,—সত্যি বড় মিষ্টি লাগে। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। চালচলন অতি শোভন, চোখ দুটো ভাবে চল চল, নিজেকে সাজাবার কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সাজা জিনিষটা যেন আপনি জোর করে এসে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে বসে যায়। কথা অতি মিষ্টি। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক এক বার কেমন উদাস পারা হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন,—দেখে আমার সেই কীর্ত্তনের পদ মনে পড়ে—

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়!

তোমাদের কত ভাগ্যি, অমন বউ পেয়েছ। দিন রাত কেবলই লিখ্‌ছেন আর পড়ছেন। আর তাঁর পড়বার ধরণটা বড় সুন্দর। সর্ব্বদাই পেন্‌সিল ও খাতা নিয়ে পড়তে বসেন; আর যখন যেখানে মিষ্টি কথা পান, তাই টুকে রাখেন। আমায় বলেছিলেন এতে কবিতা লেখার নাকি খুব সুবিধা হয়। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, "কি করে সুবিধা হয়, দিদি?" বল্লেন, "জান কি, বড় বড় কবিরা যেন এক এক জন ভারি রাজমিস্ত্রি। আর এই যে সুন্দর কথাগুলি এগুলি তাদের পঙ্খিরকাজের মালমসলা। ঐ মিষ্টি মিষ্টি কথা গুলো চুনে চুনে, "মোর," "হায়," "সখি," "সখা," "বঁধু" প্রভৃতি মিষ্টি কথার বুক্‌নী দিয়া সাজা'লেই অতি সুন্দর কবিতা হয়।"

আমিও এখন থেকে খাতা হাতে করে সব বই পড়ি। দেখ কি তোমার মেজ'বউয়ের কল্যাণে হয় ত তোমার এই ঠাকুরপোও ক্রমে একটা কবি হয়ে উঠ্‌বে। বাঙ্গলা মাসিকে ছাপাবার মতন ভারি ভারি দু-দশটা এরি মধ্যে পকেটে জড় হয়েছে। গোয়েন্দা-গিরি করতে এসে একেবারে একটা ডাকসই কবি হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে ভাগ্যি জিনিষটাই নাকি অন্ধ, তার গমনে নাইক কোন ছন্দ, আমার কপাল নহে নেহাৎ মন্দ,—কর কি

এখনও তুমি সন্ধ ; তবে তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ ; করিলাম এখানেই চিঠি বন্ধ।

৩।

বউ দিদি।

তোমার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম করি। তুমি যদি মেম সাহেব হ'তে, তা হ'লে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ তোমায় দিতাম। তোমার কল্যাণে এই গোয়েন্দাগিরি করতে এসে কি সুখেই দিন কেটে যাচ্ছে। তোমার ফরমায়েস খাট্‌তে হয় না, ছেলেদের পড়া বল্‌তে হয় না, আপিসে কলম পিসতে হয় না, ঘরে গিন্নির মুখ ঝামটা খেতে হয় না ; দিনে শুতে পাই, ঝিমুতে হয় না ; রেতে ঘুমুতে পাই, ছেলে বইতে হয় না, আর দিন রাত কবিতা শুনতে পাই, দুনিয়াশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বকাবকি করতে হয় না। আমার মনে হয়, স্বর্গে যারা যায়, তারা বুঝি এই ভাবেই দিন কাটায়। বস্তু যত সব ছায়া হয়ে গেছে, ছায়া যত সবই কেবল কায়া নয়, প্রাণী হয়ে উঠে, চারিদিকে ছুটোছুটি কচ্ছে। বিজ্ঞান পড়ে যা ভুল বুঝেছিলাম, সব এখন শুধ্‌রে যাচ্ছে। চোখ কাণ গুলোকে ফাঁকি দিয়ে এখন কেবল মন দিয়ে সব জ্ঞান আহরণ করতে শিখ্‌ছি। এ শিক্ষায় তোমার মেজ'বউ আমার গুরু হয়েছেন। সত্যি বল্‌ছি বউ দিদি, মানুষের মনটা যে কত বড় জিনিষ, এতদিন বুঝি নি। এই মনই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কর্ত্তা। তোমার মেজ'বউএর মন ঠিক তাই।

সে দিন আমরা নরেন্দ্রসরোবরের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা অতি সুন্দর মন্দির হয়েছে। তোমরা দেখ নি। মন্দিরের বাগানে বিস্তর আমগাছ আছে। একটা আমগাছে এই অকালেও নতুন লালপাতা গজিয়েছে। তোমার মেজ'বউ আমায় গাছটা দেখিয়ে বল্লে, "দেখেছ নরেন, ঐ গাবগাছে কেমন লাল লাল পাতা বেরিয়েছে।"

আমি বল্লাম—"গাবগাছ কৈ দিদি, ওটা যে আম গাছ!"

দিদি বল্লেন—"আমগাছ, কখনই নয়; তুমিও এত বড় একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত কচ্ছো? আমাদের বাড়ীর দেয়ালের আড়ালে এরই মতন একটা গাবগাছ আছে, তার এই যৌবনের সাজ দেখে আমি বসন্তের সংবাদ পেতাম। আর তাকেই কি না তুমি বল্‌তে চাও, আমগাছ?"

আমি তো একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বল্লাম, "একটু কাছে গিয়ে দেখুন, ওটা যে আমগাছ তা বুঝতে পার্‌বেন।"

তোমার মেজ'বউ আরো গরম হয়ে উঠে বল্লেন—"কাছে গেলেই কি সত্য দেখা যায়? অন্ধেরা তো হাতিটাকে গিয়ে হাতড়িয়ে-ছিল, কিন্তু তাকে সত্যিই দেখ্‌তে পেয়েছিল কি? দেখে চোক নয়—মন, আর মনের নিকটে আবার কাছে আর দূরে কি? তুমি কী দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌লে, আমি বুঝতেই পাচ্ছি না। ওটা যদি আমগাছ হবে তবে তার ডালে ডালে কোকিল কৈ? ডগায় ডগায় ভৃঙ্গ কৈ? আকাশে আকাশে কুহু কুহু কৈ? ঘরে ঘরে উহু উহু কৈ? কেবল লাল পাতা দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌ছ, লালপাতা যে গাবগাছেও হয়।"

বেগতিক দেখে বল্লাম, "তুমি যখন বল্‌ছ, তখন গাবই বা হবে।"

"গাবই বা হবে কেন, গাবই নিশ্চয়। ওটা যদি গাব না হয় তবে কবির দৃষ্টি কি মিথ্যা হবে?"

আমি বল্লাম—"কখনওই হতে পারেনা। বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগতকে দেখেন। তিনিও ত কবি।"

এতগুলি ধর্ম্মকথা বলে তবে প্রাণে বাঁচলাম। এবার থেকে তোমার মেজ'বউ যখন যা বল্‌বে, তা'তেই হুঁ দিয়ে যাব।

৪।

বউ দিদি,

আমার ছুটি তো ফুরিয়ে আস্‌ছে, আর কতদিন তোমার মেজ'-বউকে পাহারা দিতে হবে? তোমার মেজদাদাকেই না হয় পাঠিয়ে দাও, গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। যে কবিতার ঢেউ উঠ্‌ছে, তাতে তোমার মেজবউকে কোথায় নিয়ে যাবে, বলা যায় না। আর আমাকে পরের স্ত্রীর পাহারা দিতে পাঠিয়ে তোমার ঘরেও যে খুব শান্তি পাচ্ছ, তাও ত সম্ভব নয়। তবে একবার নাকি আমি আগুণের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার ফন্দিটা শিখেছিলাম, ঐ যা তোমাদের ভরশা।

সত্যি বল্‌ছি আমার ভাব্‌না হয়েছে। তোমার মেজ'বউকে এই একমাসকাল দিনরাত দেখে দেখে, এতটাই চিনেছি বলে মনে হয় যে, বাহিরে তাঁর যতই কবিতা গজা'ক না কেন, ভিতরটা ঠিক আছে। সে ভাবনা আমার হয় না। তবে জান কি, ভিতর শুদ্ধ থাক্‌লেই যে বাহিরে কালির ছিটা পড়ে না বা পড়তে পারে না, তা নয়। ঐ ভয়টাই আমার বড় বেশী হচ্ছে। অথচ কেমন করে যে বেচারীকে বাঁচাই, ভেবে পাচ্ছি না। তারই জন্য তোমাকে লিখ্‌ছি। নহিলে তোমাকেও লিখ্‌তাম না;—এ সব কথা কাউ-কেই বলা ভাল নয়। বলাবলিতেই যত গোল বাধে।

আমার আরো বেশী বিপদ হয়েছে এই জন্য যে শরৎ হঠাৎ কল্‌কাতায় চলে গেছে। বাড়ীতে তোমার মেজ'বউ একটা বুড়ো চাকরাণী আর আমি, আমরা তিন প্রাণী মাত্র আছি। তার জন্যও আমি ভাব্‌তাম না। কিন্তু শরৎটা নাকি নেহাৎ গাধা, যাবার সপ্তাহ খানেক আগে একটা সাহিত্যিক বন্ধুকে এনে জুটিয়ে দিয়ে গেছে। এব্যক্তি নিতান্ত ছোক্‌রা নয়, বয়স তোমার মেজদাদারই মতন। বল্‌ছে ত যে বিলেত টিলেত ঘুরে এসেছে, কিন্তু ইংরেজি

শুনে কথাটা বিশ্বাস করতে মন উঠে না। তবে ইংরেজ কবিদের নাম হামেষাই মুখে লেগে আছে।

ইনি তোমার মেজ'বউকে ব্রাউনীং বলে একজন খুব বড় ইংরেজ কবি আছেন, তাঁর কবিতার তর্জ্জমা করে পড়াচ্ছেন। এখন প্রতি দিন বিকেল বেলা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দুজনে কবিতা পড়েন, আর এ গরিব পাহারাওয়ালা দায়ে পড়ে কাজেই সেখানে গিয়ে বসে বসে ঝিমোয়। আমি মুখ্খু লোক,—কেরাণীগিরি করে খাই, তার উপরে কোনও দিন জাহাজে চড়ি নি। কাজেই এই সাহিত্যিকবরের চক্ষে যে অতি নগণ্য হ'ব, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে তোমার মেজ'বউএর একটা বড় বাহাদুরী দেখতে পেলাম। আমি যে তাঁর সোদর ভাই নই, তিনি ঘুণাক্ষরেও একথাটা এ ব্যক্তিকে জানতে বা বুঝতে দেন নি। একদিন ও জিজ্ঞেস কচ্ছিল—"শরৎ বাবু, আর নরেন বাবু এঁদের মধ্যে বড় কে?" তোমার মেজ'বউ বল্লেন—"নরেনই বড় বটে, তবে পিঠোপিঠি বলে শরৎ ছেলেবেলা থেকেই কোনও দিন একে দাদা বলে ডাকে নি।" কথাটা শুনে অবধি তোমার মেজ'বউএর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেছে। যতটা বোকা মনে হচ্ছিল, ততটা বোকা নন। কবিতাই লিখুন আর যাই করুন, ভিতরে ভিতরে বিষয়বুদ্ধিটুকু বেশ আছে।

৫।

বউ দিদি,

তুমি ওলোকটার পরিচয় জানতে চেয়েছ। এ সব লোকের পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। বাংলা সাহিত্যে আজকাল বড় বড় সাহিত্যিক যে কি করে গজিয়ে উঠে, ভগবানও তার ঠিক করতে পারেন কি না সন্দেহ। কবিতা যেমন এদের আকাশ থেকে ঝুর ঝুর করে পড়ে, এদের জন্মকর্ম্মটাও তেমি দিব্য ব্যাপার বলে মনে হয়। এঁকে আমরা কেবল মিষ্টার মৈত্র বলেই জানি।

শরৎকে জিজ্ঞেস করছিলাম এঁর বাড়ী কোথায়, আছে কে, করেন কি, সে ওসব কথার কোনই উত্তর দিতে পারলে না। বল্লে—"ও সব খবর সংসারের লোকেই রাখে। সাহিত্যজগৎ মনোজগৎ, ভাবরাজ্য; এখানে জন্মকর্ম্মের পরিচয় কেউ নেয় না, রসসৃষ্টির শক্তির প্রমাণপরিচয়ই যথেষ্ট। মিষ্টার মৈত্রের লেখাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এর উপরে ত আর কোনও কথা চলে না। কাজেই ইহাঁর কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাই নাই, পাবার আশাও রাখি না।

তবে নামগোত্রের পরিচয় না পেলেও, কাব্যরসপটুতার পরিচয় প্রতিদিনই পাচ্ছি। সে পরিচয়টা তোমাকে দিতে পারি। কাল বৈকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই সমুদ্রের ধারে আমরা বেড়াতে যেতে পারি নি। মিষ্টার মৈত্র এখানে বসেই তোমার মেজ'বউএর সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা কচ্ছিলেন। ইনি ব্রাউনিংএর একটা বাংলা অনুবাদ কচ্ছেন, তোমার মেজ'বউকে তাই পড়িয়ে শুনাচ্ছিলেন। ভুল ক্রমে এখানেই সে অনুবাদটা ফেলে গেছেন, তার খানিকটা তোমায় পাঠাচ্ছি।

ওগো সুন্দর মোর!

ও যেখানে তব, এ নয়ান মম
পিয়ে পিয়ে হলো ভোর।
ওগো সুন্দর মোর!

চোখের মতন কতই চাতুরী,
গুপ্ত প্রেমের কিবা এ লহরী,
নাচত আঁখিতে উঠত শিহরী
সুখের নাহিক ওর!
ওগো সুন্দর মোর!

ঘরের ভিতরে বসে যারা ঐ,
ভাবিছে কাতরে গেল ওরা কৈ,

কৌতুকে কপোল করে থৈ থৈ,
বাহিয়া বাহিছে লোর।
ওগো সুন্দর মোর!

আমরা দুজনে, বিজনে বিপিনে,
নীপ মূলে এই, কিবা নিশি দিনে,
বাঁধা আছি, নতু আঁধোয়া তু বিনে,
কে ভাঙ্গে মোদের জোড়?
ওগো সুন্দর মোর!

তিলে তিলে গড়ি কতেক ছলনা,
পলে পলে পরি শতেক গহনা,
গাহি মূলতান, পূরবী সাহানা,
কাটিছে রজনী ঘোর,
ওগো সুন্দর মোর!

এ সুখ তেয়াগি, কোন সুখ লাগি,
কোন্ মন্ত্র পড়ি, কি সিন্দুর দাগি'
কিইবা সোহাগে, মিলিবে কি ভাগি,
কলা, মোচা, কিবা, থোড়!
ওগো সুন্দর মোর!

আষাঢ় মাসের গুপ্ত অভিসার,
ভৈরব ঐ নৃত্য বরিষার,
মর্ম্ম বিদারি এ ঘর্ম্মের ধার,
চর্ম্মে ঝুরিছে ঝোর!
ওগো সুন্দর মোর!

ছাড়িয়া এ সব বিভব ছন্দে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া ভবের ধন্দে,

কোন্ রূপে রসে, পরাশে গন্ধে
আনিবে আনন্দে তোর ?
ওগো সুন্দর মোর !

থাক্ তারা নিজ জগত্ লইয়া
রান্ধিয়া বাড়িয়া, খাইয়া, শুইয়া,
জীবনে মরিয়া, মরমে মারিয়া
কেবলি ঘাঁটিয়া হোড় !
ওগো সুন্দর মোর !

জান নাকি তুমি উহাদের রীতি,
যশমান দিয়া কষয়ে পিরিতি
ঝগড়া-ঝাটি হয় নিতি নিতি
ভাঙ্গাতে ভামিনী ভোর
ওগো সুন্দর মোর !

নাহি সুতা হাতে, হলো কিবা তায়
ও রীতি দেখিলে পিরিতি পালায় ?
দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর।
ওগো সুন্দর মোর !

দাদাকে বলো, এর মূলটা ব্রাউনীংএর In A Balcony'তে কোথাও নাকি আছে। মূলের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক অনুবাদের বাহাদুরী আছে বটে। আর সব চাইতে এর বাহাদুরী এই যে তোমার মেজ'বউকে এ কবিতাটায় একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তিনি বারবার এসে আমায় বলছেন "দেখ নরেন, দেখ, দেখ, কি সুন্দর শুনাচ্ছে—

দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর—

লেখার কি ভঙ্গী, ভাবের কি গভীরতা। বাংলায় এক রবি ঠাকুর ছাড়া আর কেউ অমন লিখ্‌তে পারে না। তুমি ত ব্রাউনীং পড়েছ, ব্রাউনীং সত্যি কি এত মিষ্টি।" এর উত্তর আমি কি আর দিব। আমার কেবল ইচ্ছা হলো বউদিদি, ঐ মিষ্টার মৈত্রে-টাকে আমার এই জিমন্যাষ্টিকপটু মুষ্টিটা যে কত মিষ্টি তাই দেখিয়ে দি। সত্যি বল্‌ছি বউদিদি, এ লোকটা যদি শিগ্‌গির সরে না পড়ে, তবে কোন্‌ দিন যে আমার সঙ্গে একটা ফৌজদারী বেধে যাবে জানি না।

৬।

বউ দিদি।

যা ভয় কচ্ছিলাম, তাই হয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জুতিয়ে ঐ লোকটার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছি। বোধ হয় সে আর এখানে মুখ দেখাতে সাহস পাবে না। আজকের এই জুতাপেটাটা কেউ জানে না, কেবল আমার হাত জানে, আর জুতা জানে, আর ওর পীঠ জানে, আর কেউ জানে না; তোমার মেজ'বউও ভাল করে জানেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি ফের যদি পুরীর সমুদ্রের ধারে দেখ্‌তে পাই, তবে সবার সাম্‌নে জুতাপেটা করে ছাড়্‌ব। সে পায়ে ধরে দিব্যি করে গেছে, আজ রাত্রেই পুরী থেকে চলে যাবে। আমার বিশ্বাস তাই করবে।

কেন হলো, কিসে হলো, আমার নিজের মনে মনেও তার আলোচনা করতে ইচ্ছা হয় না; ভয় হয় বুঝিবা এ চিন্তাতেও তোমার মেজ'বউএর অকৈতব শুদ্ধ চরিত্রের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। কিন্তু তোমাকে না বল্লে নয়। তোমার মেজ'বউএর প্রাণে যে আঘাত লেগেছে, তার ফল কি যে হবে, ভেবে পাচ্ছি না। এই আঁধার রাতে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ না দিলে বাঁচি। দিনরাত আমায় এখন তাঁকে খাড়া পাহারা দিতে হ'বে দেখ্‌ছি।

ঘটনাটা তোমায় লিখ্‌তেই হচ্ছে, কিন্তু আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে দাদাও এটা জানেন। আমরা পুরুষ মানুষ, স্ত্রী-চরিত্র যে কিছুই বুঝি না, বউদিদি! তাই ভয় হয় দাদাও তোমার মেজ'বউ সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারবেন না। যদি পার, তবে তাঁকেও দেখিও না, তোমার মেজদাদার ত কথাই নাই। এই পত্রখানা পড়িয়াই পুড়াইয়া ফেলিবে।

ঘটনাটা এই। কাল রাত্রে আমার একটু সামান্য জ্বর হয়েছিল; তাই আজ সন্ধ্যার সময় আর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই নি। মিষ্টার মৈত্র এসে অনেক অনুনয় বিনয় করাতে তোমার মেজ'বউ তাঁর সঙ্গেই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। আমায় বলে গেলেন যে বেশী দূরে যাবেন না, বাড়ীর সামনেই বেড়াবেন। তখন সবে রোদ পড়েছে। আমি দরজায় বসে দুজনায় বেড়াচ্ছেন দেখ্‌তে লাগলাম। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। কাজেই আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তোমার মেজ'বউএর খোঁজে বেরুলাম। সমুদ্র তীরে গিয়া দেখ্‌লাম তিনি সেখানে নাই। ভারি মুস্কিলে পড়্‌লাম। কোনদিকে গেলেন ঠাওর করতে পারলাম না। কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি? এমন সময় একটা পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বল্লেন—"আপনি যে আজ বড় পিছিয়ে পড়েছেন, আপনার ভগিনী চক্রতীর্থের দিকে যাচ্ছেন দেখলাম।" শুনে কি জানি কেন আমার বুকটা ধড়াশ করে উঠল। চক্রতীর্থ ত দোরের কাছে নয়। স্বর্গদ্বার চক্রতীর্থ দেড় ক্রোশের পথ। আর সন্ধ্যাবেলা সে অতি নিরালা স্থান। আমিও ঐদিকেই বালি ভেঙ্গে ছুটলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। সারকিট্‌ হাউস ছাড়িয়ে দেখ্‌লাম, আর কোথাও কেউ নাই। হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কাণে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়া দেখলাম, ঐ লোকটা তোমার মেজ'বউকে অপমান করবার চেষ্টা কচ্ছে। আমি এক লাফে

তার উপরে পড়ে তোমার মেজ'বউকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার গলার চাদর কষে ধরে, পায়ের জুতা খুলে, গায়ে যত জোর ছিল তাই দিয়ে বেটাকে পিটুতে আরম্ভ করলাম। যখন ও একেবারে মাটিতে পড়ে গোঁগাতে লাগ্‌ল তখন ছাড়্‌লাম। তোমার মেজ'বউ একেবারে পাথরের মত নিশ্চল, অসাড় হয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌-ছিলেন। আমি কাছে যাবা মাত্র, মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তোমার মেজ'বউ একটু সুস্থ হলে, তাঁকে নিয়ে বাড়ী এলাম। ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে, তাঁর দশা যে কি হয়েছে বল্‌তে পারি না। এই আধ ঘণ্টা কালের মধ্যে তাঁর মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেছে, চোক বসে গেছে, মনে হয় যেন ছ মাসের রোগী। হঠাৎ মানুষের চেহারার অমন পরিবর্ত্তন হয়, ইহা জন্মে আর কখনও দেখি নাই। বাড়ী আসিয়া তোমার মেজ'বউ ঘরে যাইয়া দোরে খিল দিয়া শুয়ে পড়েছেন। আমি কি করব, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি না। যে ঝিটা আছে, তাকে কোন কথা বল্‌তেও পারি না, নিজে যাইয়াও তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে পাচ্ছি না। হয়ত এই চিঠি পেতে না পেতেই তুমি এখানে আসবার জন্য আমার টেলিগ্রাম পাবে। কাল প্রাতঃ-কালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

৭।

বউ দিদি,

ভগবান বাঁচালেন। শরৎ আজ প্রাতে ফিরে এসেছে। তা'কে কালকার ব্যাপারের কথা কিছুই বলিনি। বলা যায় কি? সে ভাবছে তার দিদির অসুখ করেছে। অসুখও করেছে সত্যি। খুব জ্বর হয়েছে। মাথার খুব যাতনা। বিকার না হলে বাঁচি। দেখি ঠাকুর কি করেন। দাদাকে তোমার মেজ'বউএর অসুখের কথাটা বলে রেখো। বাড়াবাড়ি হলে আস্‌তেই হ'বে। তারে খবর দিব।

৮।

বউ দিদি,

ঠাকুরের প্রসাদে আজ সাতদিন পরে তোমার মেজ'বউএর জ্বর ছেড়েছে। চেহারাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে, সে রং নাই, সে কোনও কিছুই নাই। চোখের ভিতরে কি যেন একটা কাতরতা জেগে উঠেছে। আজ বিকাল বেলা আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"শরৎ কোথায়?" আমি বল্লাম—"কিছু আঙ্গুর আর ডালিমের জন্য বাজারে গেছে; আর কলকাতা থেকে কিছু ফল আস্‌বার কথা, তাও এসেছে কিনা, দেখ্‌তে ষ্টেষনে যাবে।" তখন আমাকে কাছে ডেকে, বিছানায় বসিয়ে, আমার হাতখানা ধরে বল্লেন—"নরেন, তুমি আমার সত্য ভাইএর কাজ করেছ, তুমি না থাক্‌লে সেদিন আমার কি হ'তো জানি না। প্রথম দিন থেকেই আমি যে চোখে শরৎকে দেখ্‌তাম, সেই চক্ষে তোমায় দেখেছি। তাই শরৎ যখন কলক'তায় যেতে চাইলে, কোনও আপত্তি করি নাই। শরৎ আমার জন্য যা কর্‌তে পার্‌ত না, তুমি তাই করেছ, এ ঋণ জন্মে শোধ দিতে পার্‌ব না।" বলিতে বলিতে চক্ষু দুটা জলে ভরিয়া উঠিল। ক্রমে নিজকে একটু সামলে নিয়ে বল্লেন—"শরৎ সব শুনেছে?"

আমি বল্লাম "না। কিছুই শুনে নি। ওকি বলবার কথা? শরৎ কেবল জানে যে আপনার অসুখ করেছে।"

"শরৎ তো আমায় 'আপনি' বলে না, তুমি বল কেন?"

বউদিদি আমারও চক্ষে জল আসিল। একটু স্নেহের জন্য ঐ প্রাণটা যে কতই তৃষিত হয়ে আছে, দেখে আমার প্রাণটাও কেমন করে উঠ্‌ল।

বল্লাম "আচ্ছা আমি এখন থেকে তুমিই বল্‌ব। আর তুমিও শরৎকে যেমন কখন' তুমি কখন' তুই বল, আমাকেও তেমনি বল্‌বে?"

"আমার অসুখ বাড়্‌লে তোমরা কি কর্‌তে বল ত।"

"করব আর কি, ভাল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতাম।"

"এখানে কি ভাল ডাক্তার আছে।"

"এখানে নাই, কটকে আছে।"

"সেখান থেকে কি এখানে ডাক্তার আসে?"

"আনালেই আসে।"

"আমার ত অত টাকা নাই।"

"যে ডাক্তার আস্‌ত সে টাকার জন্য আস্‌ত না।"

"তবে কিসের জন্য।"

"তুমি আমার দিদি, তারই জন্য আস্‌ত।"

"সে ডাক্তার তোর কে হয় নরেন?"

"তিনি আমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জ্জন।"

"তোমার দাদা, কটকের সিভিল সার্জ্জন! তোমার দাদার নাম কি?"

আমি দাদার নাম বল্লাম। তোমার মেজ'বউ অমনি চম্‌কে উঠে বল্লে, "উনি তোর দাদা!" এই বলে চোখ দুটো আবার কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠ্‌ল। এবার আমার পালা; বল্লাম—"আমার দাদাকে কি তবে তুমি চেন?"—একটু তামাসা করে বল্লাম— "তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও দিন আমার দাদার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়ে ছিল।" তোমার মেজ'বউ বড় বিষন্ন ভাবে বল্লে;—"উনি আমার নন্দাই ছিলেন।"

"ছিলেন মানে কি, দিদি? দাদার ত দুটো বিয়ে হয় নি, আর আমার বউ দিদি তো এখনও বেঁচে আছেন।"

"তোর বউ দিদিই আমার ননদ।"

"তবে তুমি আমার দাদার শালাজ, আর এতদিন এই কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলে।"

"তুই যে ওঁর ভাই, আমি জানব কি করে?"

"তা ত বটেই। যা হোক; এখন ত জানা শুনা হলো। আজই

আমি বউদিদিকে আসতে লিখ্‌ব। কটক থেকে পুরী দু'তিন ঘন্টার পথ বই ত নয়।"

"না, না, তাকে লিখিস্‌ না। সে আসবে না।"

"আসবে না? তাঁর জা'জ এখানে বেয়ারাম হয়ে পড়ে আছেন, আর উনি আসবেন না, অসম্ভব কথা। আমার বউদিদি তেমন লোক নন। আর বউদিদিকে লিখ্‌ব তাঁর দাদাকেও যেন তারে খবর দিয়ে আনিয়ে নেন।"

তোমার মেজ'বউ আর ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারেন না। একেবারে আমার দু হাত ধরে বল্লেন—"না ভাই নরেন, তোর পায়ে পড়ি। অমন কর্ম্ম করিস্‌ না। আমি রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাদের আর এ মুখ দেখাতে পারব না।"

"শরৎ বলেছে তুমি তোমার খুড়িশাশুড়ীর সঙ্গে জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে, রাগ করে এসেছ কে বল্লে।"

"কেউ বলে নি, আমি ত জানি।"

"তোমার মনের কথা ত আর কেউ জানে না। লোকে জানে তুমি জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে। এখন বাড়ী ফিরে যাবে। তাতে হলো কি?"

"উনি জানেন।"

"তা হলে এতদিন যে উনি তোমায় নিতে আসেন নি তার জন্য মিষ্টার মৈত্রের যে ব্যবস্থা করেছিলাম, তাঁরও সেই ব্যবস্থাই করব।"

"নরেন তুই আমায় ভালবাসিস্‌ বলে ওসব বল্‌ছিস্‌। তুই জানিস্‌ না, আমি কি করেছি। আমি তাঁকে ত্যাগ করেছি।"

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লাম। "ত্যাগ করেছ কি করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জান না।"

"ডাইভোর্স কিরে?"

"মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে, ইংরেজেরা তাকেই ডাই-

জোর্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।"

"কিন্তু আমি ত করেছি তাই।"

"করেছ কি, খুলেই বল না, দেখি।"

"ওঁকে লিখেছি, আমি আর ওঁর স্ত্রী নই।"

"ঐকথা! সব স্ত্রীই ত রাগ করে ওকথা বলে।"

"ঝগড়ার মুখে ওকথা বলিনি, কোনও দিন ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় নি। তাই বুঝি ছিল ভাল।"

"তবে কি করেছ?"

"আমি তাঁকে শান্তভাবে, ঠাণ্ডা হয়ে, চিঠি লিখেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী নই।"

"আবার একটা বে কর্‌তে বল নি ত?"

"তা বল্‌তে যাব কেন? তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি কর্‌বেন। সে দায় আমার নয়।"

"ঐ দেখ, তুমি তাঁকে ছাড়নি; ছাড়্‌লে তাঁর বিয়ের কথায় অমন হয়ে ওঠ কেন?"

"না নরেন, সত্যি আমি তাঁকে ছেড়েছি।"

"তিনিও কি তোমায় ছেড়েছেন?"

"তাঁর ছাড়ার অপেক্ষা ত আমি রাখি নি।"

"তবে তিনি যদি না ছাড়েন।"

"তাও কি হয়, আমি যে তাঁকে ছেড়েছি।"

"স্বামী স্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না, দিদি। যে দেশে মাজিষ্টরের কাছে রেজিষ্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মাজিষ্টরের কাছে গিয়ে রেজিষ্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ কর্‌তেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। জান না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে হয়, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।"

"আমি যে তাঁকে ছাড়্‌লাম বলে লিখেছি।"

"লিখেছ তাতে হলো কি? ছেলেটা বেশী বিরক্ত করলে, মা যে কতবার বলে মর, মর; তাতে কি আবার সেই ছেলেকে বুকে টেনে রাখে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, রাগের মাথায় মানুষ যা বলে তাতে মিথ্যা বলার পাপ হয় না।"

"আমি যে কি করেছি তুই জানিস্‌নে নরেন, নইলে অমন কথা ভাব্‌তে পার্‌তিস্‌ না"

"কি করেছ? ঝগড়াঝাটি করনি; মারধর করনি; একখানা চিঠি লিখেছ বই ত নয়?"

"সে চিঠি দেখলে ওকথা কইতিস্‌ না। চিঠিখানা দেখ্‌বি? ঐ বাক্সের ভিতরে তার নকল রেখেছি। বের করে নে।"

চিঠিখানা পড়ে বল্লাম, "এই ত, অমন চিঠি আমরাও কত পাই। তাতে হয়েছে কি?"

এমন সময় শরৎ এসে হাজির হলো।

বিকাল বেলা তোমার মেজ'বউএর আর জ্বর আসে নি। এখানকার ডাক্তার বল্লেন, আর জ্বর হবে না। এখন ওঁকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯।

বউদিদি,

আজ একটা খুব নতুন খবর আছে। বিন্দু বলে যে মেয়েটা আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে শুনে তোমার মেজ'-বউএর এই বিরাগ হয়েছিল, সে মরেনি। শরৎ কলকাতা থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে। বিন্দু নিজেও তোমার মেজ'বউকে চিঠি দিয়েছে। কি সামান্য ভুল ভ্রান্তি ধরে কত বড় ট্র্যাজেডির (মাপ কর বউদিদি, ট্র্যাজেডির বাঙ্‌লা আমি জানি না) সৃষ্টি হতে পারে, এই ঘটনায় তাই বুঝ্‌লাম। বিন্দু মরে নি। শরৎ বিন্দুর শ্বশুর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল। তাই সেই গলিতেই আর একটা বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়ে জানে, সে বাড়ীর নতুন

বউ কাপড়ে আগুন লাগিয়ে স্নেহলতার মতন আত্মহত্যা করেছে। ঐ খবর নিয়ে এসেই ত যত গোল বাধিয়েছে। বিন্দু কেবল মরে নি তা' নয়, এখন অতি সুখে আছে। তোমার মেজ'বউকে সে যে চিঠি লিখেছে, সেখানা নকল করে দিলাম, পড়ে দে'খ। রাগ করো না, বউদিদি, বিন্দু যে প্রথমে অতটা গোল বাধিয়ে তুলেছিল, তা তোমার মেজ'বউএর শিক্ষারই গুণে, তার নিজের স্বভাব-দোষে নয়। তোমার মেজ'বউ নিজে এখন এটা বুঝেছেন, নইলে আমি ওকথা কইতাম না। বিন্দু সর্ব্বদাই নিজেকে বড় নিষ্পীড়িত মনে করত। তোমার মেজ'বউই এভাবটা তার প্রাণে বেশী করে জাগিয়ে দেন। আর যে আপনাকে সর্ব্বদাই নির্য্যাতিত ও নিষ্পীড়িত ভাবে, তার দ্রোহিতা অবশ্যম্ভাবী। সব বিদ্রোহীর ভিতরকার কথাই এই। বিন্দুর কথাও তাই। তোমার মেজ'বউএর কথাও তাই। বিন্দু এখন এরোগমুক্ত হয়েছে; তোমার মেজ'বউও ঠাকুরের কৃপায় আরোগ্যের পথে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিন্দুর পত্র

শ্রীশ্রীচরণেষু,

দিদি আমি মরি নাই। তোমরা যে খবর পেয়েছিলে সেটা মিছে কথা। আমি যে দিন আবার আমার শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসি, তার দুদিন পরে, আমাদের পাশের বাড়ীতে একটা বউ কাপড়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। তারও নাম বিন্দু ছিল। ওরা আমাদেরই জাতি। তারও এই দু'তিন মাস আগে বে হয়। এরই জন্য আমিই মরেছি বলে কথাটা রটে যায়। দিদি,

আমি মরি নি। আর এমন সুখে আছি যে মর্‌বার কোন সাধ আমার আর নাই।

ঐ মেয়েটা যখন পুড়ে মরে, আমি দেখেছিলাম। আমার শোবার ঘরের পাশেই ছাদ, আর তার পরেই ওদের ছাদ। তখন রাত দুপোর হবে। আমরা তার চীৎকারে জেগে উঠে, দৌড়ে বাহিরে গিয়ে দেখি, মেয়েটার চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে, আর সে "বাবা গো, আমি মরবো না, আমি মোরবো না"—বলে বিকট চীৎকার কচ্ছে। তার মুখের সে ছবি আমার প্রাণের ভিতরে কে যেন ঐ আগুন দিয়ে দেগে দিয়েছে। যখনই মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটে, এত ভয় হয়। আমি ঐ দেখে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। উনি আমাকে কোলে করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, সারা রাত বাতাস করে, কত রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ঐ ভয়টা তাড়াতে চেষ্টা করেন। আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম; আর উনি, ছেলে ভয় পেলে মা যেমন তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঘুমাতে দেয়, তেম্নি করে সারারাত জেগে আমার গায়ে হাত রেখে, আমার মাথায় বাতাস করে, পাহারা দেন। ভোর বেলা চোখ মেলে দেখি, এইভাবে বসে আছেন। দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমি বড় সুখে আছি।

তুমি আমার দুঃখ অনেক দেখেছ, আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কেঁদেছ, আমাকে মার পেটের বোনের মতন ভাল বেসেছ। জন্মে আমি তার আগে অমন আদর ও ভালবাসা পাই নাই। আর তুমি অমন করে ভালবাস্‌তে বলেই আমার বিয়ে করতে এত অনিচ্ছা ছিল। তোমার ঐ আদর ছেড়ে পরের বাড়ী যেতে একেবারেই মন চাইল না। তাই তোমার পায়ে ধরে অত কেঁদে-ছিলাম, বলেছিলাম আমায় বিয়ে দিও না, দাসী করে নিজের কাছে রাখ। আমার রূপ নাই জান্‌তাম। সবাই বল্‌ত অমন

কাল মেয়ের কি আবার ভাল বে হয়? আমার বাপ মা নাই। টাকা কড়ি নাই। শুন্‌তাম একরাশ্‌ টাকা নইলে কোনও মেয়ের বে হয় না। তাই আমার যখন বিয়ের সম্বন্ধ এল, তখন ভাব্‌লাম যে এর ভিতরে অবশ্য একটা কিছু ভারি গলদ আছে; নইলে অমন কাল মেয়েকে, অমন মাবাপখেগো গরিব মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায় কে? তাই ভয় হচ্ছিল, কোথায় যাচ্ছি। মনে মনে ভাব্‌লাম অমন কাল মেয়েকে যে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়, না জানি সে কত কুৎসিত। আমার মনের কথা কেউ জানে না, দিদি, কেবল এই আজ তোমায় বল্‌ছি। তোমায়ও এসব কথা কোনও দিন কইতাম না, যদি ঠাকুর আমার ভাগ্যে এত সুখ না লিখ্‌তেন। সুখ পেয়েছি বলেই আজ দুঃখের কথা কইতেও আমার সুখ হয়। কি বল্‌ছিলুম? হাঁ, ঐ আমার বের রাতের কথা। মনে মনে আমার স্বামী অতিশয় কুৎসিত হবে ভেবে রেখেছিলুম বলে, শুভদৃষ্টির সময় আমি জোর করে চোখ দুটাকে চেপে রেখেছিলুম। ছেলেবেলা আঁধার রাতে ঘরের বাহিরে গেলে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বুজে থাকতাম, তেমনি করে চোখ বুজে রইলাম। তার পর বাসর ঘরে গিয়ে আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। গল্প শুন্‌তাম বাসর ঘরে কত লোক থাকে, কত রং তামসা হয়, আমার বাসরে সে রকম কিছুই হলো না। একজন বুড়ী আমার হাত ধরে নিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তা' পরে উনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বিছানার এক পাশে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। একবার তিনি আমার হাত খানা এসে ধরলেন, তার পরেই ছুড়ে ফেলে গর্‌গর্‌ কর্‌তে কর্‌তে উঠে গেলেন, আর সারা রাত ঐরূপ গর্‌গর্‌ করে পাইচারি করে কাটালেন। মাঝে একবার মনে হল যেন, অনেকগুলি কাচের বাসন হাতে ছুড়ে ফেলে চুরমার করে ফেল্লেন। আমি বুঝ্‌লাম, এ ব্যক্তি পাগল। তার পর দিন যখন খেতে বসেছি, অমনি তেড়ে

একেবারে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; আর ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে, উনুনে জল ঢেলে, হেঁসেলের ভাতবেন্নুন সব জুতা শুদ্ধ পায় লাথি মেরে চারিদিকে ছড়িয়ে চলে গেলেন। আমি দেখে শুনে ভয়ে ভয়ে প্রাণের দায়ে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম। তার পর কি হলো, তুমি জান। তুমি আমায় রাখ্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু আমার ভাশুর যখন নিতে এলেন, তখন দেখ্‌লাম তোমাদের বিপদ হ'তে পারে, তাই তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলাম। এবারে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। আমি চলে এসেছি শুনে উনিও বাড়ী ছেড়ে চলে যান। তার পর যখন শুনলাম, আবার ফিরে এসেছেন, তখন আবার আমার পিত্তি শুকিয়ে গেল। তাই আবার পালিয়ে আমার খুড়্‌তাত ভাইদের ওখানে যাই। ওরা যখন কিছু-তেই স্থান দিলে না, তখন কাজেই আবার ফিরে আস্‌তে হলো। আমার গাড়ী যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন দেখ্‌লাম একটী নতুন লোক আমাকে গাড়ীর দরজা খুলে তুলে নিলেন। আমি ভাব্‌ছিলাম আমার শাশুড়ী বা বাড়ীর ঝিচাকরাণী বুঝি কেউ এসে দরজা খুল্‌ল; তাই নিঃশঙ্কোচে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। দিদি, দেখলাম একজন অতি সুন্দর পুরুষ। যেমন মুখ, তেমনি রং, যেমন কোঁকড়া কাল চুল, তেমনি বড় বড় টানা চোখ, যেমন নাক তেম্নি সব। পুরুষের অমন রূপ জন্মে দেখিনি। মিথ্যা বল্‌ব না, দিদি, দেখেই মনে হলো, হা রে কপাল! অমন স্বামি যদি আমার হ'ত! আমি তাঁর পিছু পিছু অন্দর মহলে ঢুকলাম। তখন ইনি ডেকে বল্লেন—"মা, তোমার বউ এসেছে, আমার ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।" গলার স্বরে আমার সর্ব্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। পা যেন আর চলে না। শরীরটা যেন হঠাৎ ভারি হয়ে পড়্‌ল। মনে হলো যেন আমি ভেঙে পড়্‌ছি। তখন তিনি আমার হাত ধরে একেবারে দুতালায় শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। যত্ন করে বিছানায় বসালেন। পাখা

নিয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগলেন। তার পর বল্লেন—অমন মিষ্টিভাবে জন্মে আমার সঙ্গে আর কেউ কথা কয়নি, দিদি, অভিমান করো না, তুমিও কইতে পারনি—"একবার এদিকে এস।" আমি যেন পুতুলবাজির পুতুল সেজেছি। অমনি ধীরে ধীরে উঠে তাঁর সঙ্গে গেলাম। বারান্দায় একখানা কাঠের চৌকি ছিল, আমায় সেখানে বসালেন। তার পর নিজে একঘড়া জল এনে আমায় পা ধু'তে দিলেন। আমি লজ্জায় মরে যেতে লাগ্‌লাম, কিন্তু বাধা দিবার শক্তি ছিল না। আমাকে হাতে মুখে জল দিতে বল্লেন, নিজে দাঁড়িয়ে সে জল ঢেলে দিলেন। তার পরে আবার ঘরে এসে, নতুন বাণারসী শাড়ী বের করে বল্লেন, "কাপড় ছাড়, তোমার ফুলশয্যার জন্য এখানি এনেছিলাম, আজই তোমার ফুলশয্যা।" এই বলে বারান্দায় গেলেন। আমি সেই শাড়ীখানি কোনও মতে পরলাম। হাত পা কিছুই যেন আর আমার নিজের বশে নাই। আমার কাপড় ছাড়া হলে, এক বাক্স গহনা বের করে, —তোমার দেওয়া গহনাগুলি একে একে খুলে ফেলে, নিজের হাতে বালা, বাজু, অনন্ত, চিক, ইয়ারিং পর্য্যন্ত পরিয়ে দিলেন। কতক্ষণ যে এই গহনা পরাতে লাগ্‌ল, বল্‌তে পারি না। এক এক খানি গহনা পরাচ্ছেন্, আর অনিমেষে ক্ষানিকক্ষণ সে অঙ্গটাকে দেখ্‌ছেন। এক এক বার মনে হতে লাগ্‌ল, বুঝি এ ব্যক্তি সত্যি সত্যি পাগল। আবার মনে হতে লাগ্‌ল, দুনিয়ার সব ভাল লোকের চাইতে আমার এ পাগলই ভাল, এ পাগলকে গলায় বেঁধেই আনি মরব। সব গহনা পরান শেষ হলে আমার মুখখানি তুলে ধল্লেন,—আমার তখন চোখ বুজে থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দিদি, পোড়া চোখ তা করে না, চার চক্ষে মিলন হলো। এই আমাদের শুভদৃষ্টি। দিদি, আমার চোখ জলে ভরে আস্‌ছে, আমি যে কাল, আমি নাকি কুৎসিত, তবু ওঁর চক্ষে বুঝি বা আমিও বড় সুন্দর। নইলে ও চোখ আমায় দেখে অমন হয় কেন?

দিদি, ইনি পাগল নন। ছেলে বয়সে একবার বড় মদ গাঁজা খেতে আরম্ভ করেন, তারই জন্য মাঝে ক'দিন একটু ক্ষেপে উঠেছিলেন সত্য। কিন্তু সে প্রায় দশবার বছরের কথা। এখন তামাক পর্য্যন্ত ছোঁন না। তবে বড় বদরাগী লোক। রাগলে জ্ঞান থাকে না। আর, দিদি, যে রাগতে জানে না, সে ত পাথর, সে কি ভালবাসতেই জানে? জান কি, আমায় বে কল্লেন কেন? স্নেহলতা মেয়েটা যখন আত্মহত্যা কল্লে, ঐ কথা শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা কল্লেন যে, যার কোনও রকমে বরপণ দিবার সম্বল নাই, তেমন বাপের মেয়ে না পেলে বে করবেন না। তাই খুঁজে খুঁজে ঘটকী আমায় বের কল্লে। এ বিয়েতে তাঁর বাপমায়ের বড় আপত্তি ছিল। তাঁরা প্রথমে টাকা খুঁজছিলেন। যখন ছেলে পণ নিয়ে বে করবেই না কোট করে বসলো, তখন আর কিছু না হউক যার দুপয়সা আছে, বারমাসে তের পার্ব্বণে তত্ব পাঠাতে পারবে, এমন ঘরের মেয়ে বে করুন, তাঁরা তাই চাচ্ছিলেন। কিন্তু উনি এতেও নারাজ হলেন। তাতেই বাপ বেটাতে ঝগড়া হয় ও বাপ ছেলের বিয়েতে থাকবেন না বলে কাশী চলে যান। আমার শাশুড়ী বাড়ী ছেড়ে গেলেন না বটে, কিন্তু আমি যে কুলিনের মেয়ে এ অপরাধটা ভুলতে পাল্লেন না। তারই জন্য আমাকে হাড়ীবাগদীর মেয়ের মতন পিতলের থালাতে ভাত দিয়েছিলেন। হয় ত ভেবেছিলেন, অতি গরীবের ঘরের মেয়ে, তাতে আবার বাপ মা নাই, এরূপেই বুঝি আমি লালিতপালিত হয়েছি। তারই জন্য উনি অমন রেগে উঠেছিলেন। মাকে ত আর কিছু মুখে বলতে পারেন না, তাই কতকটা আমার উপর দিয়ে, আর কতকতটা থালাবাসন ও হাঁড়ীকুড়ির উপর দিয়ে সে রাগটা চালিয়ে দিলেন। আর উনি যে সব গহনা দিয়েছিলেন, ওঁর মা আমায় সেগুলি পরিয়ে দেন নি বলে বিয়ের রাতে অমন করে রেগে গিয়েছিলেন।

দিদি, আমি ভাবি, তোমরা যদি আমায় সত্যি সত্যি রাখতে, আমার খুড়তুত ভাইয়েরা যদি আমায় স্থান দিত, আর একমুঠা

জাত যেখানেই হউক আমার মিলতই,—তাতে আমার কি সর্ব্বনাশই হতো। অমন দেবতার মতন স্বামীকে পেতাম না। আর স্বামিকে পেয়েছি বলে, শ্বশুর, শাশুড়ী সবাইকে পেয়েছি। ভাশুর, যা, ভাশুর-পো, ভাশুর-ঝী, সকলে আমার কতই আপনার হয়ে গেছে। দিদি, আমি নিজেকে ওদের সেবায় নিযুক্ত করে, ওদের মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। এখন আর আমার নিজের কোনও দুঃখ নাই। সুখ আমার উপ্‌চে পড়্‌ছে। দিদি, অনেক দিন তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আমার ছোট্ট দুঃখের কান্না কেঁদেছি, আজ বড় সাধ যায়, ঐ বুকে ছুটে গিয়ে এইবার আমার সুখের কান্না কাঁদি। আমার দুঃখে চিরদিন দুঃখু পেয়েছ, এবার আমার সুখ দেখে সুখী হও।

শুন্‌লাম আমি মরেছি শুনে তুমি বিবাগী হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছ। আমি যখন সত্যি সত্যি বেঁচে আছি, তখন তুমি আর ঘর বাড়ী ছেড়ে থাক্‌বে কেন? আর মরেই কি কখনও তোমার দুঃখে আমার সুখ হতো? স্বামীর কোলে মাথা রাখাতে যে কি সুখ, তা ত তুমি জান। তুমি আমার জন্য এই স্বর্গসুখও ছেড়েছ, শুনে অবধি আমার নিজের সুখ যেন আধখানা হয়ে গেছে। তুমি শিগ্‌গির ফিরে এস। তোমায় বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। লক্ষ্মী দিদি আমর, শিগ্‌গির ফিরে এস। আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিবে।

তোমারই সেবিকা

বিন্দু।

চতুর্থ অধ্যায়।

মেজ'বউএর পত্র।

ঠাকুর-ঝি,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ঠাকুর-পোর কথা কি আর লিখ্‌ব, আমার জন্য সে যা করেছে, শরৎ তা কর্‌তে পার্‌ত না। ভগবান তাকে এনে জুটিয়েছিলেন বলেই তোমার মেজ'বউ এখনও বেঁচে আছে।

আমাকে তোমার ওখানে যেতে বল্‌ছ। আমি কি করেছি তা জান্‌লে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখ্‌তে চাইতে না! অমন দেবতার মতন স্বামী, তাঁকে কতই না অনাদর, কতই না অপমান করেছি। শাস্ত্র মতে আমি পরিত্যক্তা। কারণ অপ্রিয়ভাষিণী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর্‌বে, শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

আমি তোমার দাদাকে পরিত্যাগ করেছি। তিনি আমায় ছাড়েন নি, আমিই ছেড়ে এসেছি। আমি তীর্থ কর্‌তে আসি নি, ওটা একটা ছুতা মাত্র। আমি আর তোমাদের সম্পর্ক রাখ্‌ব না বলে এসেছি। স্ত্রীলোকের মনের যে অবস্থা হলে আজকাল তারা নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরে, আমি সেই মন নিয়ে বাড়ী ছেড়ে আসি। মরতে সাহস হয় নি বলে মরি নি। সতী স্ত্রী আপনি মরে, আমি তা করি নি, স্বামীর ভালবাসাটাকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা করেছি।

ঠাকুর-ঝি, তোমরা সতী সাধ্বী, আমি যে তোমাদের অস্পৃশ্যা। আমায় মাপ কর। আমি তোমাদের কাছে এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না। স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক, এই প্রার্থনা করি।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঠাকুর-পোর পত্র।

বউদিদি,

আমি ত কিছুতেই তোমার মেজ'বউকে বাড়ী ফিরে যেতে রাজি করাতে পাল্লাম না। তোমাকেই আস্‌তে হবে। তোমার দাদা যদি আসেন, আরও ভাল হয়। তোমাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঠাকুর-ঝীর পত্র।

মেজ'বউ,

তুমি যখন এলে না, আমরাই তখন যাচ্ছি। মেজদাদাকেও লিখেছি, তিনি রবিবারে এখানে আস্‌বেন। উনিও শালাজকে দেখ্‌তে যাবেন। তিন দিনের ছুটী নিয়েছেন। আমরা তিন জনে সোমবার প্রাতে তোমার দোরে গিয়ে অতিথি হবো। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

সপ্তম অধ্যায়।

আবার স্ত্রীর পত্র।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

ঠাকুর-ঝীর পত্রে জান্‌লাম, এই সোমবারে তুমি এখানে আস্‌বে। তোমার পায়ে পড়ি, এস না—আমিই যাচ্ছি। আমার জন্য এই কষ্ট স্বীকার করে, এ হতভাগিনীকে আর নতুন করে অপরাধিনী করো না।

তুমি এস না বল্‌ছি; কিন্তু তোমার কাছে কোনও কথা গোপন করব না। তুমি আস্‌বে শুনে আমার প্রাণটা যে কি করে উঠ্‌ল, তোমায় বুঝাতে পার্‌ব না। তুমি আস্‌বে বলেই আমি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছি। নইলে বাকি জীবন হয় ত এমনি করে এই তুঁষের আগুণে পুড়ে মরতে হতো। তুমি আস্‌ছ শুনে বুঝ্‌লাম তুমি তোমার এ কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর নি। আজ ঈশ্বরের দয়াতে আমার সত্য বিশ্বাস জন্মাল। লোকে যতই পাপ করুক না কেন, তিনি যে কাউকে ছাড়েন না, তোমার এ ক্ষমা দেখে তাই বুঝ্‌লাম।

আর, সত্যি বল্‌ছি, ঈশ্বর কে, তা ত আমি জানি না। এক জন মনগড়া ঠাকুরের পায়ে এতকাল জীবনের সুখদুঃখের কথা বলেছি, কিন্তু এত দিন পরে আমার সত্য ঠাকুরকে আমি পেলাম।

তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেইত তোমায় এত অযত্ন, এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি। পনর বছর কাল তোমার ঘর কল্লাম, কিন্তু এক দিনও তোমার পানে তাকাই নাই, কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অহঙ্কারই করেছি, তোমার ঐ বিশাল জ্ঞানের দিকে তাকাই নাই; আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি, তোমার ত্যাগকে লক্ষ্য করি নাই; কেবল পাবার জন্যই ছটফট্ করেছি, কোনও দিন তোমায় সত্যভাবে কিছু দিই নাই। এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝ্‌লাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয়; ত্যাগেই শান্তি, ভোগে নয়। যে আপনাকে বড় করে, সেই ছোট হয়ে যায়, যে নিজেকে ছোট করে, সেই বড় হয়ে উঠে। আমি তোমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তোমার সমান হতে গিয়ে, তোমাকেও ধর্‌তে পাল্লাম না, নিজেকেও রাখ্‌তে পাল্লাম না। আজ এই

কলঙ্কের কালি মেখে, তোমার চরণের ধুলি হয়ে, তোমাকেও ধরেছি, নিজেকেও পেয়েছি। আমি বার বছরের ছোট্ট বালিকা তোমাদের এত বড় পরিবারের মধ্যে এসে পড়্‌লাম। কিন্তু তোমাদের বিশালত্বের ভিতরে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে হারাতে পারলাম না। লোকে বল্‌ত আমার রূপের কথা, অমন রূপ বাঙ্গালীর ঘরে হয় না—আমি তারই গর্ব্বে কেঁপে উঠ্‌লাম। মা বাবা বল্‌তেন আমার বুদ্ধির কথা, আমি সেই অহঙ্কারেই ঘট হয়ে বস্‌লাম। তুমি শিখালে আমায় লেখাপড়া, আমি তাই নিজেকে বিদ্বান ভেবে একেবারে টঙ্গে চড়িলাম। অন্য লোক হলে কত ঝগড়াঝাটি হতো। কিন্তু তুমি একদিন একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত বল নি। যখন বড় অন্যায় করেছি, মুখখানা কেবল একটু ভারি হতো। এত করে তোমায় কষ্ট দিয়েও আমি যখন যা চেয়েছি তুমি তাই দিয়েছ। কোনও দিন কিছুতে 'না' করনি। 'না' কথাটা বিধাতা তোমায় শিখান নি। বাড়ীর যে যা ইচ্ছা তাই করে, তুমি কোনও দিন কারও ইচ্ছার প্রতিরোধ কর নি। আমি ভাবতাম তোমার পুরুষত্ব নাই। ভেবে দেখি নি যে, এই দুনিয়ার মালিক্ যিনি তিনিও ত অমনি ভাবেই চুপ করে বসে আছেন। তুমি ভাইদের মধ্যে সকলের চাইতে বেশী রোজগার কর, তুমি যদি কোনও বিষয়ে কথা কও, পরিবারে শান্তি থাক্‌বে না। যার যত শক্তি বেশী, যে যত কর্ম্মী বড়, সে তত চুপ করে থাকে। এই মোটা কথাটা আমি তখন বুঝিনি। আমি নিজেকে তোমা থেকে কেবলই আলাহিদা করে দেখ্‌তাম বলে, তোমার মহত্ব যে কত ও কোথায় তা বুঝ্‌তে পারি নি। তাই আমার এ দুর্গতি। আমি সব ছোট জিনিষকে বড করে তুল্‌তাম, তাই তুমি যে অত বড় তা বুঝি নি, তোমাকেও ছোট বলে ভেবেছি। এই করে জীবনের এই পনর বছর খুইয়েছি। সব জীবনটাই খোয়াতে বসেছিলাম।

আমার সকল অপরাধের কথা ত শুন নি। তোমাকে ছেড়ে

এসে আমায় কি অপমান সহিতে হয়েছে, তুমি জান না । সে দিন যদি তোমার বোনের দেবর নরেন আমার খোজে এসে ঐ অপমান থেকে আমায় না বাঁচাত, তাহলে এই সমুদ্রেই চিরদিনের মতন তোমার মৃণাল ডুবে মরিত। অরক্ষিতা স্ত্রীর অঙ্গ পরপুরুষে স্পর্শ কল্লে অনেক স্বামী শুনেছি তাকে আর গ্রহণ করে না। অপরের কথা কি, স্বয়ং রামচন্দ্র পর্য্যন্ত করতে চান নি। আমায় কি তুমি গ্রহণ করবে? এই কথাটা তোমায় না বলে আমি তোমার কাছে যেতে পারি না।

বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার চরণা-শ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া সত্যকে পেয়েছে। আর আমি নিজেকে নষ্ট করতে বসে সত্যকে দেখেছি। তুমি আমায় রাখ বা ছাড়, যাই কর না কেন, আমি তোমারই চির-দিনের চরণাশ্রিতা

মৃণাল।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

১। বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে ?

বৌদ্ধধর্ম্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর কোন ধর্ম্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবীরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্দ্ধেকেরও বেশী বৌদ্ধ। বর্ম্মা, সায়াম, ও আনাম অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহলদ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাঙ্গামাটীর ত কথাই নাই। উহারা বর্ম্মা আরাকানের শিষ্য। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এখনও বৌদ্ধ মত চলে। তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই সকল মহলে অনেক দিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা মহিমপন্থ নামে এক নূতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহারা ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করেন না। বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ ভরভর করে। যাঁহারা বলেন ৫ম মহাশূন্যে তারা ও ৬ষ্ঠ মাহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহেন, কারণ কোন হিন্দু কখনও শূন্যবাদী হন নাই, হইবেন না ও ছিলেন না।

একালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব আরও বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কীস্তান একালে বৌদ্ধধর্ম্মের আকর ছিল। সেখান হইতে সামেয়েদেরা এবং তুর্কীস্থানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম পাইয়াছিল। পারস্য একালে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পূরাই বৌদ্ধ ছিল। পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ রোমান কাথলিকদিগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতি, বৌদ্ধদেরই মত। রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুই জন 'সেণ্ট' বা মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম 'বারলাম' ও 'জোসেফট'। অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে এই দুইটি শব্দ বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্বশব্দের রূপান্তরমাত্র।

অনেকে এই বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা বড় আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই। মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের নামও শুনেন নাই। তবকতিনাশিরী ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস হইবার ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, মহম্মদি বক্তিয়ার ঐ বিহারটাকে কেল্লা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত "দুর্গরক্ষী সৈন্য" বধ করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন সৈন্যদিগের চেহারা আর এক রকম; তাহাদের সব মাথা মুড়ান ও পরনে গেরুয়া কাপড়। তখন তিনি মনে করিলেন ইহারা "সব মাথা মুড়ান ব্রাহ্মণ"। আবুল ফাজল এত বড় "আইনি আকবরী" লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই বৌদ্ধেরাও বড় করে নাই; করিয়াছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কিরূপ হইতেছে? শুনা যায় একালে কোন অন্ধনিবাসের লোকে হাতী দেখিতে ইচ্ছা

করিয়াছিল। সকলেই অন্ধ, সুতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতী দেখান কঠিন। সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতীর কাছে লইয়া গেলেন। কানারা হাত বুলাইয়া হাতী দেখিতে লাগিল। কেহ শুঁড়ে হাত বুলাইল, কেহ কানে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বুলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, কেহ লেজে হাত বুলাইল, সকলেরই হাতী দেখা শেষ হইল। শেষে সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেখানে সকলে ঝগড়া করিতে লাগিল। কেহ বলিল হাতী কুলার মত, কেহ বলিল হাতী নলের মত, কেহ বলিল হাতী উল্টা ধামা, কেহ বলিল হাতী বড় উঁচু, কেহ বলিল হাতী থামের মত, কেহ বলিল হাতী চামরের মত। সকলেই বলিতে লাগিল 'আমার মতই ঠিক'। সুতরাং ঝগড়া চলিতেই লাগিল, কোনরূপ মীমাংসা হইল না। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই ঘটিয়াছে। ইউরোপীয়েরা সিংহলদ্বীপেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম দেখেন ও সেইখানেই পালী শিখিয়া বৌদ্ধদের বই পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ধর্ম্মনীতির সমষ্টিমাত্র, উহাতে কেবল বলে 'হিংসা করিও না', 'মিথ্যা কথা কহিও না', 'চুরি করিও না', 'পরস্ত্রীগমন করিও না' 'মদ খাইও না'। হজ্‌সন্‌ সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর। কেহ বা শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদীমাত্র, কেহ বা তাহাও বলেন না। যে সকল দর্শনের মত আঠার ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি সেই সকল মত নেপালের পুঁথির মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এ সকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই তিন শতে চলিতে-ছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিতে পান। তিনি দেখেন উহার আকার অন্যরূপ। উহাতে পূজাপাঠ ইত্যাদির বেশ ব্যবস্থা আছে। তিনি দেখেন, বৌদ্ধমঠমাত্রেই একএকটি পাঠ-

শালা। ছোট ছোট ছেলেরা পড়ে। যিনি তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিলেন, তিনি দেখিলেন, সেখানে কালীপূজা হয়, সেখানে মন্ত্রতন্ত্র আছে, হোমজপ হয়, মানুষপূজা হয়। চীনদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম আবার আর এক রূপ। তাহারা সব মাংস খায়, সব জন্তু মারে; অথচ বৌদ্ধ। জাপানীরা বলে 'আমরা মহাযান অপেক্ষাও দার্শনিকমতে উপরে উঠিয়াছি'। অথচ আবার তাহাদের মধ্যে এক দল বৌদ্ধ আছে, তাহারা নানারূপ দেবদেবীর উপাসনা করে।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম নানাদেশে নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে; কোথাও বা উহা পূর্ব্বপুরুষের উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভূত প্রেত উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দেহতত্ত্ব-উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার খাঁটি বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাঁটি নাগার্জ্জুনের মত চলিতেছে। সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি পূরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ভাষার গোল। বুদ্ধের বচনগুলি তিনি কি ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার বাড়ী ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোন ভাষাতে তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে সকল অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না সংস্কৃত, না মাগধী, না কোশলী; এক রূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন 'Mixed Sanskrit'.। 'বিমলপ্রভা' নামে নয় শতের এক পুঁথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল; মগধদেশে মগধভাষায়, সিন্ধুদেশে সিন্ধু ভাষায়, বোটদেশে বোটভাষায়, চীনদেশে চীনভাষায়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারস্যদেশে

পারস্যভাষায়, রুম্মদেশে রুম্মভাষায়। আমরা জানি পারস্যদেশে মগের ধর্ম্ম চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও 'জরথুস্ত্র'র শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ছিল, এ কথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। রুম্মদেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, বিমলপ্রভায় বলে, উহা নীলা-নদীর উত্তর। বিমলপ্রভায় আরও একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সঙ্গীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্য্যন্ত অতি অল্পলোকেই জানেন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানামুনির নানামত আছে।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়া এবং পালি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করেন, তাঁহারাই যথার্থ বৌদ্ধ। গৃহস্থবৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে রাজী নহেন। তাঁহারা বলেন, ত্রিপিটকে যাহা কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই বিহারবাসী ভিক্ষুদের জন্য। বিনয়পিটকে যত বিধি-ব্যবস্থা আছে, সবই ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের তাহাতে স্থান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহারা "পঞ্চশীল" গ্রহণ করে অর্থাৎ "প্রাণাতিপাত করিব না", "মিথ্যাকথা কহিব না", "চুরি করিব না", "মদ খাইব না", "ব্যাভিচার করিব না"—এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলে এক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। যে সকল জাতি দিনরাত প্রাণিহিংসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত্ত, শিকারী, ব্যাধ, থেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।

এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবীশুদ্ধই বৌদ্ধ; কারণ, যিনি

বোধিসত্ত্ব হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। লঙ্কাবাসীর মত আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এইজন্য নেপাল ও তিব্বতবাসীরা লঙ্কাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ বলেন এবং আপনাদিগকে মহাযান বৌদ্ধ বলেন। এখানে 'যান' শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বিবাদবিসম্বাদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার ইংরাজী করেন Vehicle অর্থাৎ গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'যান' শব্দের অর্থ পন্থ বা মত। আমরা যেমন এখন বলি নানকপন্থী দাদুপন্থী কবীরপন্থী, সেকালে বৌদ্ধেরা সেইরূপ বলিত শ্রাবকযান, প্রত্যেক যান, বোধিসত্ত্বযান, মন্ত্রযান ইত্যাদি। Vehicle-এর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মহাযান বৌদ্ধেরা আপনাদের বড় দেখাইবার জন্য আগেকার বৌদ্ধদিগকে হীনযানী বলিত, আর আপনাদিগকে বোধিসত্ত্বযান বলিত।

মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎশুদ্ধই ত বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন 'আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গানপত, পৌত্তলিক, রাজপূজক ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব'। কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কি, সে কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না; এইমাত্র বলেন 'যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব'। এবিষয়ে কারণ্ডব্যূহে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব অবলোকি-তেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তুমি কি করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতে ত নানামুনির নানামত, লোক তোমার কথা শুনিবে কেন?" তখন করুণামূর্ত্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন, "আমি বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিববিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনয়কবিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, রাজভটবিনেয়-দিগকে রাজভটরূপে উদ্ধার করিব"। এরূপে তিনি যে কত

দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সেইজন্য উপরে তাহার কয়েকটি-মাত্র দেওয়া হইল। এ মতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওজফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন "তোমরা যে ধর্ম্মেই থাক, যে দেব-তার উপাসনাই কর, ধর্ম্মে এবং চরিত্রে বড় হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিষ্ট এবং যে কেহ থিওজফিষ্ট হইতে পারে"। এও কতকটা সেইরূপ, তবে ইঁহাদের অপেক্ষা মহাযানী বৌদ্ধদের জগতের প্রতি করুণা কিছু বেশী ছিল। তাঁহারা নিজেই চেষ্টা করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে যাইতেন; তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহারা বলিতেন "আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব"। সেইজন্য মহা-যান ধর্ম্মের সারের সার কথা "করুণা"। উহাঁদের প্রধান গ্রন্থের নাম "প্রজ্ঞাপারমিতা"। উহার নানারূপ সংস্করণ আছে; এক সংস্করণ শত সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পঁচিশ হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ দশহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আটহাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাতশত শ্লোকে, আর এক সংস্করণ, সকলের চেয়ে ছোট, স্বল্পাক্ষরা—"স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা",—উহার তিনটি পাতা মাত্র। প্রজ্ঞাপারমিতা আরম্ভ করিতে হইলে কতকটা গৌরচন্দ্রিকা চাই—শেষ করিতে গেলেও কতকটা আড়ম্বর চাই। এই সব বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে উহাতে একটিমাত্র কথা সার—"সকল জীবে করুণা কর"।

মহাযানের মর্ম্ম গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি অনেকেরই অভ্যাস আছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্ব্বাণের অভিলাষী, তাঁহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যে কথা শোভা পায়,

মানুষের মুখে সে কথা আরও অধিক শোতা পায়। ইহাতে বুঝা যায় তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রেই বৌদ্ধ, কিন্তু এ কথায় ত কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানারূপ ধর্ম্ম ছিল, মত ছিল, দর্শন ছিল, পন্থ ছিল, যান ছিল। মহাযান যেন বলিলেন, সকলেই বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা সে কথা মানিবে কেন? সুতরাং বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনও আছে। ইহার মীমাংসা কি? বৌদ্ধেরা জাতি মানে না যে, ব্রাহ্মণাদির মত জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে, বৈষ্ণব হইবে বা শৈব হইবে। একে ত বৌদ্ধগৃহস্থেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই সন্দেহ, তারপর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বৌদ্ধ হইবে কিনা তাহাতে আরও সন্দেহ। এখনও এবিষয়ে কোন ইউরোপীয় বা এদেশীয় পণ্ডিতেরা কোন মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকর গুপ্তের আদি-কর্ম্ম রচনা নামক বৌদ্ধদের স্মৃতিতে ইহার এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেওয়া আছে। তিনি বলেন, যে কেহ ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ।

ত্রিশরণ শব্দের অর্থ—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত।

কিন্তু পরে পুরোহিতের নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। হস্তসার গ্রন্থে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে। যেমন খৃষ্টানের পুত্র হইলেই সে খৃষ্টান হয় না, তাহাকে বাপ্টাইজ করিলে তবে সে খৃষ্টান হয়, সেইরূপ বৌদ্ধ পিতামাতার পুত্র হইলেও, যতক্ষণ সে ত্রিশরণ গমন না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধদের যতগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে যে গুলিকে তাহারা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন করিত, সেই গুলিকে আদিকর্ম্ম বলিত। সেই সকল আদিকর্ম্মের মধ্যেও আবার ত্রিশরণ গমন সকলের আদি। বিমলপ্রভায়ও লেখা আছে আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রত্নত্রয়ের শরণ লইলেই যদি বৌদ্ধ হয় এবং সেরূপ শরণ লইবার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে জেলে, মালা, কৈবর্ত্তদের বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশের আর বাধা রহিল না। বিনয়পিটকে লেখা আথে যে, যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে তাহাকে ভিক্ষু করিতে পারিবে না ও তাহাকে সঙ্ঘে লইতে পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে বেচারী বৌদ্ধ হইতে পারিবে না। শুভাকর গুপ্তের ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুব্বি করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর দলের নাম সঙ্ঘ। যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিত তাহার নাম সঙ্ঘারাম। সংঘারামের মধ্যে প্রায়ই একটি মন্দির থাকিত, তাহার নাম বিহার। সেই মন্দিরের নাম হইতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বলিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মের গুরু কে?

শিক্ষানবীস একজন ভিক্ষুকে মুরুব্বি করিয়া সঙ্ঘে উপস্থিত হন। সেখানে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু, যাঁহাকে স্থবির বা থেরো বলে,

শ্রাবকযানের গুরু

তিনি নবীসকে কতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার সময় সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্থবির নবীসের নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাহার কোন উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজার কোন চাকরী করে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার ভিক্ষাপাত্র আছে কিনা, তাহার চীবর আছে কিনা, অর্থাৎ, ভিক্ষু হইতে গেলে যে সকল জিনিস দরকার, তাহা তাহার আছে কিনা। সে এসব জিনিস আছে বলিলে, তিনি সঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আপনারা বলুন এই লোককে সঙ্ঘে লওয়া যাইতে পারে কিনা। যদি আপনাদের ইহাতে কোন আপত্তি থাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন'। তিনি এইরূপ তিনবার বলিলে, যদি কোন আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবীসকে জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার উপাধ্যায় কে?" সে উপাধ্যায়ের নাম বলিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইত। সে উপাধ্যায়ের নিকট সন্ন্যাসীর কি কি কাজ, সব শিখিত। এখনকার ছেলেরা যেমন মাষ্টারমহাশয়দের মান্য করিয়া চলে, শিক্ষা-নবীস, শ্রমণের, সেইরূপে আপনার উপাধ্যায়কে মান্য করিয়া চলিত। ক্রমে সে সব শিখিয়া লইলে তাহাতে ও উপাধ্যায়ে কোন প্রভেদ থাকিত না। সঙ্ঘে বসিলে, দুজনের সমান ভোট হইত।

উদাহরণ

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে "প্রব্রজ্যা" দিয়াছিলেন, তখন তিনি উহাকে বৈদেহ মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহ মুনি নন্দকে আপনার বন্ধুর মত দেখিতেন, বন্ধুর মত তাহাকে পরামর্শ দিতেন ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে বৈদেহ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেন "কেমন, নন্দ বেশ শিখিতেছে ত?" বৈদেহ মুনি যেমন জানিতেন, সমস্ত খুলিয়া বলিতেন। যেখানে বৈদেহমুনি নন্দকে কোন বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া

তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে বৈদেহমুনি ও নন্দের অনেক কথা লেখা আছে। তাহাতে বেশ দেখা যায়, বৈদেহমুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দুজনে পরস্পর বন্ধুভাবেই বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করিতেন।

মহাযানের গুরু

মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে "কল্যাণমিত্র" বলিত। কল্যাণমিত্র শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণকামনায় গুরু শিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযান-মতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চ্চা করিতেন। এখানে গুরু-শিষ্য অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইত না। সঙ্ঘে অধিকার দুজনেরই সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পরের মিত্র হইতেন।

মন্ত্রযানের গুরু

ক্রমে যখন এত দর্শনশাস্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যখন ভিক্ষুরা বিবাহ করিতে লাগিলেন; প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল, তখন মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই ফল পাওয়া যাইবে। প্রজ্ঞাপারমিতা পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে এবং প্রজ্ঞা-পারমিতার ক্রিয়াকর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরও বেশী দিন লাগে। এত ত তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রটী জপ কর, তাহা হইলেই সব ফল পাইবে।" যখন বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটা আঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটী কথা উঠিল--"গুরুপ্রসাদ", "শিষ্যপ্রসাদ", মন্ত্রপ্রসাদ", অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। যে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে মন্ত্রযান প্রবেশ করে, সে সময়

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানা যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য্য ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত। বাস্তবিকও যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্য্যই করিবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার ত পিতারই, তবে তিনি যদি না পারেন, তবে একজন প্রতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া দিবেন। শিক্ষক বা আচার্য্য পিতার প্রতিনিধিমাত্র। আচার্য্যের মৃত্যুতে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। এখনও যিনি গায়ত্রী উপদেশ দেন, সেই আচার্য্য গুরু মরিলে, ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। মন্ত্রযানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড় ও একজন ছোট হইয়া গেল।

বজ্রযানে গুরু আরও বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী।

বজ্রযানের গুরু

এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর একজন বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য্য বলিত। বজ্রাচার্য্যের পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু, অর্থাৎ, তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকেও শিষ্যের 'প্রসাদ' খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোনই দরকার নাই।

সহজযানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ নাই। মন্ত্র-

সহজযানের গুরু

পাপ কার্য্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে। সহজযানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে পঞ্চকাম উপভোগের দ্বারা মূর্খলোক বদ্ধ হয়, গুরুর উপদেশ লইয়া সেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়াই মুক্ত হইয়া যায়।

গুরু উবএসেঁ অমিঅরসু হবহিঁ ণ পীঅই বেহিঁ।
বহুসত্তথ মরুত্থলিহিঁ তিসিএ মরিথই তেহিঁ॥

"গুরুর উপদেশই অমৃতরস। যে সকল হাবারা উহা পান না করে তাহারা বহু শাস্ত্রার্থরূপ মরুস্থলীতে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়।" গুরুর উপদেশ ভিন্ন সহজপন্থীদের কোন জ্ঞানই হয় না; আগম, বেদ, পুরাণ, তপ, জপ সমস্তই বৃথা; গুরুর উপদেশমাত্রই সত্য।

আগম বেঅ পুরাণে পংডিত্তমাণ বহন্তি।
পক্কসিলিফলঅ অলি বা জিম বহেরিত ভমঅন্তি॥

"যাহারা আগম, বেদ ও পুরাণ পড়িয়া আপনাদের পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব্ব করে তাহারা পক্ব শ্রীফলে অলির ন্যায় বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়"।

এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মান বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

কালচক্রযান

কালচক্রযানে যে গুরুর মান্য কত অধিক তাহা একটি কথাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে। লঘুকালচক্রতন্ত্রের টীকা বিমলপ্রভা যিনি লিখিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীক, আপনাকে অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায় বা অবতার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর কেহ নহেন। কালচক্রযানের পর লামাযানের উৎপত্তি। সকল লামাই কোন না কোন বড় বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে। দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি মরেন

না, তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ হয়। তিনি এক কায় ত্যাগ করিয়া কায়ান্তর ধারণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিত্রমাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার।

বৌদ্ধধর্ম্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে। তন্ত্র-মতে গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পাদপূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়; গুরু শিষ্যের সর্ব্বস্বের অধিকারী, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্য্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত। বৈষ্ণবের মতেও তাই। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কর্ত্তাভজা হইতেছেন। তাঁহারা বলেন "গুরু সত্য, জগন্মিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব

(শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল

যুরোপীয় এবং ভারতীয় সাধনা।

যুরোপ যত বড় হউক না কেন, তার বাহিরেও যে একটা আরও বড় জগত আছে, যুরোপের সভ্যতা ও সাধনাই যে জগতের একমাত্র বা শ্রেষ্টতম সভ্যতা ও সাধনা নয়, অথবা চীনের বা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা যে বিশ্ব-মানবের শৈশব-লীলা মাত্র ছিল, তার পরিপূর্ণ যৌবন-লীলা প্রথম যুরোপেই হইতেছে, এ সকল কথার ভ্রান্তি ক্রমে ধরা পড়িয়াছে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর যুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, সমষ্টিগত মানব সমাজের সভ্যতা ও সাধনা একটা সরল রেখার ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। জীব-জগতের ক্রমবিকাশের বা ইভোলিউশনের ধারাকে ফরাসী পণ্ডিত লা মার্ক এই ভাবেই কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ সে ভুল খণ্ডন করিলেও, আজিকালিকার সমাজ-বিজ্ঞান মানব সমাজের ক্রমবিকাশে সেই লামার্ক-কল্পিত ক্রমই দেখিতেছে। চীন একদিন কতকটা পরিমাণে একটা বিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতা ও সাধনা গড়িয়া তুলিয়া ছিল; তারপর চীনের বিকাশক্রম চিরদিনের মতন থামিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালে একটা অত্যদ্ভুত সভ্যতার ও সাধনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; কিন্তু সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে; তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই। মানবপ্রকৃতির ও মানবের সভ্যতার এবং সাধনার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দেখিতে হইলে, এখন যুরোপের গ্রীক্-রোমক্ গথিক্-ছিব্রু-খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সাধনারই আলোচনা করিতে হইবে। যুরোপের

জনসাধারণের ত কথাই নাই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যেও চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এই ধারণা প্রবল রহিয়াছে। এই ভ্রান্তিটা দূর করিবার জন্য ভারতের সভ্যতা ও সাধনা বিশ্বমানবের উন্নতি কল্পে কতটা কি করিয়াছে বা না করিয়াছে, তার আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশীয়েরাই যে কেবল এ সকল তত্ত্বের সন্ধান্ রাখেন না, তাহা নহে। আমরাও ভাল করিয়া এ সকল কথা জানি না। আমাদের স্বদেশাভিমান, এবং এই স্বদেশাভিমান হইতে যে স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব সর্ব্বত্রই জাগিয়া উঠে, সেই পক্ষপাতিত্বের বা পেট্রিয়টিক বায়সের (patriotic bias'এর) প্রভাবে আমরা আমাদের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনাকে জগতের অপর সকল সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে। য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া, য়ুরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না; আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশী করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এ বিষয়ে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়েই স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। উভয়ের বিচারই সেই জন্য সত্য-ভ্রষ্ট। উভয়েই সত্যাভাস মাত্রকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সত্যকে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন।

বিশ্বমানব।

সত্য কথা কিন্তু এইযে বিশ্বমানব বিশ্বব্যাপী। ছোট বড়, পুরাতন ও অধুনাতন, য়ুরোপ আসিয়া আফ্রিকা ও মার্কিণ, সকল

আজ মহাদেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বিশ্ব-মানবের অথবা নর-নারায়ণের লীলাভূমি হইয়া আছে। সে লীলা বিশ্বব্যাপী লীলা। এই লীলাময় বিশ্বমানব এক অখণ্ড বস্তু বা তত্ত্ব। সকল মানবে ও সকল মানব সমাজেই ইনি একই সঙ্গে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অব্যক্তরূপে তিনি কোথাও পরিপূর্ণ নহেন। কোনও সমাজ, কোনও সভ্যতা, কোনও সাধনা, এই বিশ্বমানবের বা Universal Humanity'র আত্মবিকাশধারার একটী বা দুইটী বা তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ (moments) প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। আর অপর কোনও সমাজ, সাধনা ও সভ্যতা বা তার আর দুই তিনটী তরঙ্গ-ভঙ্গ বক্ষে ফুটাইয়া অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। ভারতবর্ষও বিশ্ব-মানবের অঙ্গ, বিশ্ব-মানবের লীলাক্ষেত্র, বিশ্ব-মানবের লীলার সহায় ও সহচর। য়ুরোপও তাহাই। য়ুরোপ তাঁর এই বিশ্ব-ব্যাপী লীলা-নাট্যের দু'একটী অঙ্কের অভিনয় করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতবর্ষ অপর দু'একটী অঙ্ককে আপনার ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রকট করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতের ও য়ুরোপের সত্যের এবং সাধনার আলোচনা করিবার সময় সর্ব্বদা এই কথাটা মনে করিয়া রাখা প্রয়োজন।

সামান্য-মনুষ্যধর্ম্ম।

মানুষ মাত্রেরই কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে। এই গুণ-সামান্যই মনুষ্যত্বের সার্ব্বজনীন নিদর্শন। সকল মানুষেরই চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও নিয়ন্তারূপে সকলেরই কতকগুলি সাধারণ মনোবৃত্তি আছে। আর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় একটা রূপ-রস-শব্দ-স্পার্শময় বহির্জ্জগৎও সকলের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। চিরদিনই মানুষ এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বহির্জ্জগতে বিচরণ করিয়া আপনার জীবনের অশেষবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়াই মানুষ

সর্ব্বত্র আপনার দর্শন ও বিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানুষের ইন্দ্রিয় সকল মোটের উপরে এক এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় এই রূপরসাদিপূর্ণ বহির্জগৎও স্বল্পবিস্তর সমানধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এই সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা এবং সাধনা বিভিন্ন ভাবে দেখিযাছে। একই সময়ের ও একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকেও একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বভাব ও অভ্যাস অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া লয়। জগতের ভিন্ন ভিন্ন সাধনাও সেইরূপ মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিচার ও আলোচনা করিয়া, জীব ও জগৎ, জীব ও জগতের পরস্পরের সম্বন্ধ, জীবের জন্ম ও মৃত্যু, জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি ও পরিণতি, এ সকল সম্বন্ধে কতকগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তকেই দর্শন কহে। এই সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষ আপনার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি ও জ্ঞান-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু একদিকে যেমন মানুষের একটা অনন্ত জ্ঞান পিপাসা আছে, অন্যদিকে সেইরূপ তার অনন্ত রসপিপাসা এবং কর্ম্ম-লিপ্সাও রহিয়াছে। কেবল জ্ঞানেতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। যাহাকে সে জ্ঞানেতে লাভ করিল, তাহাকে সে ভোগ করিতে চাহে, তার মধ্যে সে আনন্দ অন্বেষণ করে, তার সঙ্গে সে রসের সম্বন্ধ পাতাইতে যায়, তাহার দ্বারা তার ভাবেরও তৃপ্তি করিবার জন্ত সে লালায়িত হয়। ফলতঃ, জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিক মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই রস বা ভাব জাগে। ভাব জাগিলেই তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও সম্যক্ সার্থকতার জন্ত সেই জ্ঞান ও ভাব উভয়ে মিলিয়া কর্ম্মের প্রেরণাকে জাগাইয়া দেয়। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম—Reason, Emotions, Will—এই তিন পাদে মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই পূর্ণ হয়।

জ্ঞানের পূর্ণতা অপূর্ণতা, ভাবের পরিপক্বতা বা অপরিপক্বতা, কর্ম্মের পটুতা বা অপটুতা,—এ সকল বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ থাকে বটে। কিন্তু যেখানে জ্ঞান সেখানেই ভাব, যেইখানেই ভাব সেইখানেই কর্ম্ম-চেষ্টা,—অনায়ত্তকে আয়ত্ত, যাহা লোভনীয় অথচ আপাততঃ অলব্ধ, তাহাকে লাভ করিবার জন্য বহুবিধ উপায়-উদ্দেশ্যের সংযোজন,—এসকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্মই সাধন। যে পরম-তত্ত্ব ঐ জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও ভাবের আশ্রয় তাহাই এই সাধনের নিত্য সাধ্য বস্তু।

মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতবর্ষের প্রভাব।

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সাধনা মানবীয় অভিজ্ঞতার একটা বিশেষ মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছে, মানব জীবনের কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, মানবসমাজের গঠন ও বিকাশের কতকগুলি বিশেষ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানব জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট সাধন অবলম্বন করিয়াছে। এইগুলি ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার বিশিষ্ট ও নিজস্ব বস্তু। এইগুলিই বিশ্বমানবের বিকাশে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট কর্ম্ম। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল হইতে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত, মধ্য-আশিয়ার বিস্তৃত উপত্যকাভূমি হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ও মধ্য আশিয়াখণ্ডে ভারতের এই সাধনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দুই হাজার বৎসরকাল এই বিশাল মানব সমাজ যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন, যে সমাজ-নীতির অনুসরণ, জীবনে যে আদর্শের সাধন করিয়াছে, তার গভীরতম মর্ম্ম এবং মূল সূত্রগুলি ভারতের তত্ত্ববিদ্যার, ভারতের সমাজনীতির এবং ভারতের ধর্ম্ম-নীতির ও ধর্ম্ম-সাধনের মধ্যেই কেবল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী রোমক্-শাসন-যন্ত্র, রোমক-রাষ্ট্র-তন্ত্র, এবং রোমক-ব্যবহার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হইয়া পৃথিবীতে একটা

নূতন একতার ও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কোনও দিন আশিয়াখণ্ডে এরূপ কোন পার্থিব সাম্রাজ্যের বা শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে নাই, বা করিতে চাহে নাই। কিন্তু রোম যেমন য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার রাষ্ট্র-তন্ত্র, ব্যবহার-বিধি, এবং শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইরূপে ভারতবর্ষও সমগ্র মধ্য ও প্রাচ্য আশিয়াখণ্ডের সভ্যতা ও সাধনাকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তির এবং পারমার্থিক সাধনার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছে। পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তি বা পার্থিব সম্পদ ও সাধনার প্রভাব অপেক্ষা যে পরিমাণে গভীরতর হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনার উপরে রোমের প্রভাব অপেক্ষা প্রাচ্য আশিয়ার সভ্যতা ও সাধনার উপরে ভারতবর্ষের প্রভাবও সমধিক গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে আশিয়ার এই বহুবিস্তৃত ভূভাগে, এই অগণ্য কোটি লোকপুঞ্জের মধ্যে, জাতি-বর্ণ-গত, আচার-অনুষ্ঠান-গত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-গত, অশেষ প্রকারের বৈষম্য ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু এসকল ভেদবিরোধের মধ্য দিয়াই আমরা একটা বিশিষ্ট আকারের সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি আদর্শ এবং সাধন পন্থাও দেখিতে পাই। আর ভারতের তত্ত্বজ্ঞানই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সমাজ-তন্ত্র, জীবনাদর্শ, ও ধর্ম্মকর্ম্মকে আত্মজ্ঞানের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া তার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই প্রাচ্য আশিয়ার এই সাধারণ সভ্যতা ও সাধনাকে আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের যন্ত্র ও সাধনরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষ যে কেবল প্রাচ্য আশিয়ার সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও আধ্যাত্মজীবনকেই আপনার তত্ত্বজ্ঞান ও সাধন-পন্থার দ্বারা পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহা নহে। যে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে আশিয়া সত্যের সন্ধানে গিয়াছে, তার মূল উপাদান ও প্রণালী, তার বৈজ্ঞানিক অনুভূতি বা scientific concepts,

যে ভাবে আশিয়া এই প্রত্যক্ষ জগৎকে জানিতে ও ধরিতে গিয়াছে তার শ্রেণীবিভাগ, আর মানুষের সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের যে সকল সূত্র ও সন্ধান ধরিয়া আশিয়া সত্তার বা সত্যং এর এবং চৈতন্যের বা জ্ঞানং এর মূল প্রকৃতির অনুসন্ধানে যাইয়া আপনার বিবিধ তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তৎসমুদায়ই ভারতের নিকট হইতে পাইয়াছে। জাপানের ও চীনের তর্কশাস্ত্র ভারতের ন্যায়ের মূল সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। য়ুরোপের ন্যায়দর্শন গ্রীশীয় ন্যায়ের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রীশীয়দিগের প্রমাণপ্রতিষ্ঠার প্রণালী ভারতের প্রমাণবিজ্ঞানের প্রণালী হইতে ভিন্ন। জাপানের ও চীনের প্রমাণবিজ্ঞানে ভারতীয় ন্যায়েরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীশীয় ন্যায়ের নহে। ভারতবর্ষের প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা phioslophy of nature জড় ও গতির, কারণ ও কার্য্যের, দেশ ও কালের যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, চীনের মধ্যযুগের বিজ্ঞান তাহারই উপরে গড়িয়া উঠে। হিন্দুর রাসায়ণজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই চীনে কোনও কোনও পণ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। চীন নানা প্রকারের রঙ্গের আবিষ্কার করিয়াছে, আর তার কতকগুলি হিন্দুর রাসায়ণবিদ্যার আশ্রয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি বিশেষজ্ঞেরা মধ্যযুগের চীনের এবং জাপানের ললিতকলাতেও ভারতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

দর্শনের উপাদান।

ইহজীবনে আপনার শরীর মনের আশ্রয়ে মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে তার নিগূঢ় মর্ম্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়। অভিজ্ঞতা বলিতে এক জন জ্ঞাতা, এই জ্ঞাতার কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কতকগুলি শারীরিক যন্ত্র ও মানসিক বৃত্তির প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মানুষই

জ্ঞাতা এবং প্রত্যেকেরই জ্ঞানলাভের জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও কতক-গুলি মনোবৃত্তি আছে। এই জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয় মোটের উপরে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম, সে তার নিজকে জানে, আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা রূপে জানে, অতএব সে নিজে তার নিজের জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। ২য়, সে এই বিশাল বিষয়-রাজ্যকে জানে, এই বহির্জগতের রূপরসাদি তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া তার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ৩য়, সে অপর মানুষকে এবং এই মানুষ যে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে তাহাকেও জানে। ঐ বহির্জগৎ বা বিষয় রাজ্য (আর এখানে আমাদের শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মনোবৃত্তি সকল পর্য্যন্ত বিষয়পদবাচ্য হয়) এবং অপর মানুষ ও মনুষ্য-সমাজ—এই উভয়ই আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় ইদং পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই ইদংকে যে জানে, যে ইদংএর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া, যাহাকে এই ইদংএর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়—সেই মানুষ অহং পদ-বাচ্য হয়। এই অহং ও এই ইদংকে লইয়া মানুষের যা কিছু লীলাখেলা। এই দুই তত্ত্বের আশ্রয়েই মানুষ তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতার উৎপত্তি কোথায়, স্থিতি কিসে, গতি কোন্ দিকে, নিয়তি কি, ইহার প্রকৃতি ও প্রণালী, মূল্য ও মর্ম্ম কি, এসকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাই-য়াই যাবতীয় দর্শনের বা তত্ত্ববিদ্যার সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভারতের সাধনা এই মানবীয় অভিজ্ঞতার কি বিশেষ তত্ত্ব ও মর্ম্ম উদঘাটন করিয়াছে? আমাদের দেশে এই বিশ্ব সমস্যার কিরূপ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে,—সকলের আগে আমি এই প্রশ্নেরই অলোচনা করিব। তারপরে হিন্দু এই বিশাল বিষয় রাজ্যকে কোন্ চক্ষে দেখিয়াছে, মানুষ এবং মানবসমাজ সম্বন্ধেই বা হিন্দু কোন্ বিশেষ সিদ্ধান্তের, তত্ত্বের ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছে, ক্রমে এসকল বিষয়েরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমে এই শান্তিবাচন আছে,—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে॥
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"ওঁ তাহা (অর্থাৎ বিশ্বের অব্যক্ত বীজ) পূর্ণবস্তু। ইহা (অর্থাৎ ঐ বীজের ব্যক্ত আকার) পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয় তখন পূর্ণই কেবল অবশিষ্ট থাকে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

হিন্দুরা কি ভাবে আপনার যাবতীয় অভিজ্ঞতার মর্ম্ম উদঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই শান্তিবাচনে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে এই হেঁয়ালির ব্যাখ্যা দেখিতে পাই।

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত মাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদং রূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নোহি স প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বা-নোমনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। সযোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদ অকৃৎস্নোহ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি আত্মেত্যেবোপাসীতাত্রহ্যেতে সর্ব্বে একং ভবন্তি তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মাঽনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ। যথাহবৈপদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবংবেদ।"

"তখন সেই অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ব্রহ্মই কেবল ছিলেন। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুই নামরূপের দ্বারা ব্যক্ত হইলেন। এই জন্য এখনও লোকে নাম ও রূপের দ্বারাই সমুদায় পদার্থকে বিশিষ্ট করিয়া থাকে—বলে "ইহার এই নাম", "উহার এই আকার"।

"সেই ব্রহ্ম এই ব্যক্ত ও নামরূপের দ্বারা বিশিষ্টকৃত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট

হইলেন। নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ক্ষুর যেমন আপনার আধানে নিঃশেষে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ হইলেন। অথবা সকল বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে যে বায়ুমণ্ডল, তাহা যেমন আপনার মণ্ডলস্থিত সকল জীবের অন্তর্বাহ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই ব্রহ্ম সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

"কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সকলের অন্তরতর ও অন্তরতম বস্তু, তথাপি অল্পবুদ্ধি লোকে তাঁহাকে দেখে না। তাঁহাদের নিকট তিনি অকৃৎস্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন। তাঁর অনুপ্রাণনেই জীবের প্রাণন ক্রিয়া সম্ভব হয়। এই জন্য ইহারা তাঁহাকে প্রাণ নামে অভিহিত করে। তাঁহারই প্রেরণায় জীবের বাণী উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা তাঁহাকে বাক্ বলে। সেইরূপ শ্রবণ জন্য তাঁহাকে শ্রোত্র, দর্শন জন্য তাঁহাকে চক্ষু, মনন জন্য তাঁহাকে মন বলে। কিন্তু এ সকল তাঁর কর্ম্মেরই নাম মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্রাদির নাম ও কর্ম্মের মধ্যে তিনি অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব যাহারা তাঁহাকে প্রাণাদিরূপে ভজনা করে, তাহারা সমগ্র তত্ত্বের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের এই অপূর্ণজ্ঞাননিবন্ধন তারা সচ্চিদানন্দ পুরুষের সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

"এই আত্মাতেই তাঁর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা বিরাজিত; জ্ঞান, আনন্দ, প্রাণ, সকলই এই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মাতেই এ সকল বহুবিধ নামরূপ এক হইয়া আছে। "ঐ" আর "এই" সকলই আত্মা; "তাহ," ও "ইহা" সকলই আত্মা। যাঁহাকে আত্মা কহে এ সকল তাঁহারই বিবিধ জ্ঞানবলক্রিয়া। আত্মাই এ সকলের বীজ ও আশ্রয়। এই আত্মার উপাসনার দ্বারাই সকল জ্ঞান লাভ হয়। যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে আপনার ঈপ্সিত লাভ করে, সেইরূপ এই আত্মাকে যে জ্ঞাত হয় সে কীর্ত্তি এবং পরমানন্দ ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

"এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম মন্ত্রে "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ"—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এই সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল আত্মা মাত্র ছিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন আর কেহ ও কিছু নাই, তখন তিনি "অহং" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন—

এই সকল বলিয়া এবং এই পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য, অপর দেবতা উপাস্য নহেন, এই উপদেশ করিয়া, শ্রুতি এখন, এই পঞ্চম ব্রাহ্মণে, এই আত্মা হইতে কিরূপে এই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অনন্ত এবং তিনি নিত্যই পরিপূর্ণ। এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী পরিপূর্ণ ঈশ্বর আংশিক বা অপূর্ণ ভাবে কোনও বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন না। এইরূপ কল্পনা তাঁর ঈশ্বরত্বেরই বিরোধী। তিনি যেখানেই থাকেন, পরিপূর্ণ রূপেই থাকেন। অতএব অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাতে তিনি পরিপূর্ণ রূপেই বিরাজ করেন। কিন্তু তাই বলিয়া অগ্নি বায়ু প্রভৃতিকে ঈশ্বর রূপে ভজনা করা সঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্রুতি কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরম পুরুষকে অগ্নি কিম্বা বায়ুরূপে ভজনা করে, তার উপাসনা অপূর্ণ হয়; কারণ এ সকল তাঁর ক্রিয়া বিশেষের বা গুণবিশেষের প্রকাশ মাত্র, তাঁর সর্ব্বগুণ প্রকাশ করে না।

পরমপুরুষ পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে উপাসিত হন, তখনই কেবল তাঁর পূর্ণ উপাসনা হয়। এই আত্মা বা "অহং"ই জ্ঞানের ও চৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই জন্যই পরমেশ্বর যখন আত্মারূপে বা "অহং" রূপে উপাসিত হন, তখনই তাঁর সত্য উপাসনা হইয়া থাকে। অপিচ, এই আত্মা বা অহং শব্দ পূর্ণতা জ্ঞাপক। জীব শরীরের আর কোনও চেষ্টা এই অহং প্রত্যয়ের পূর্ণতার সমকক্ষ হইতে পারে না। প্রাণন, শ্রবণ, দর্শনাদি মানুষের ক্রিয়া বিশেষের বিভিন্ন অংশ মাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সে অহং বলে, তখন তার মধ্যে এই সমুদয়ের প্রাণনাদি ক্রিয়া এবং তার অতিরিক্ত আরও অনেক তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকে। অতএব পরম-পুরুষের মধ্যে আমরা যে সকল গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ও পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, এই অহং নামে বা শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকে অধিক ব্যক্ত করিয়া থাকে।"

উপরে মূল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার মাধ্বভাষ্যের মর্ম্ম বাঙ্গলা করিয়া দিলাম। আমার বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই প্রাচীন ঋষিবাক্যে আমরা তিনটী বিশেষ তথ্য প্রাপ্ত হই;—

১ম,—একটা পূর্ণতত্ত্বের অনুভূতি, আর আত্মাই এই পূর্ণতত্ত্ব। ২য়,—আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" বলি সেই অস্মদ প্রত্যয়ের বস্তুই আত্মবস্তু, আর এই আত্মবস্তুই বিশ্বের পরমতত্ত্ব ও পূর্ণ তত্ত্ব। ৩য়,—এই আত্মার অন্বেষণ ও আত্মাকে জ্ঞানেতে প্রাপ্ত হওয়াই পরমানন্দ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণতত্ত্ব।

যাহাতে এই বিশ্ব সমস্যার নির্ব্বিরোধ মীমাংসা হয়, তাহাকেই আমাদের দর্শনের পরিভাষায় তত্ত্ব কহে। এই ঋষি বাক্যেতে আমরা এই পূর্ণতত্ত্বের বা পরমতত্ত্বের একটা গভীর অনুভূতির প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এই বিশ্বের বস্তু বা বিষয় অশেষ; চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও এক নহে। ইহারা প্রত্যেকেই জাগতিক বস্তু সকলের এক একটী গুণ বা ধর্ম্মকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া থাকে। চক্ষু বস্তুর রূপ, কর্ণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, এইরূপে প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের নিকটে উপস্থিত করে। এখানে একত্বানুভূতির সম্ভাবনা কোথায়? বৃহদারণ্যক শ্রুতি কহিতেছেন, আপাততঃ যাহা বহুরূপে প্রতীত হইতেছে, মূলে তাহা বহু নহে। যাহা খণ্ড খণ্ড বলিয়া দেখা যাইতেছে, মূলে তাহা অখণ্ড। যাহা অপূর্ণ বোধ হইতেছে তাহা পূর্ণ। ব্রহ্মই সেই এক, সেই অখণ্ড, সেই পূর্ণ বস্তু বা পূর্ণ তত্ত্ব। চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সেই পূর্ণবস্তুরই বিবিধ ও বহুমুখী প্রকাশ মাত্র। এই জন্য ইহারা ব্রহ্মেরই নিদর্শন। সেই ব্রহ্মকে, সেই পূর্ণতত্ত্বকেই ইহারা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে, কেবল মাত্র আংশিক বা খণ্ডবস্তুকে প্রকাশ করে না।

আত্মাই পূর্ণতত্ত্ব।

বাহিরের বিবিধ বিষয় ও জীবের এই সকল ইন্দ্রিয় যে ব্রহ্মের আংশিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি মাত্র প্রকাশ করে, আত্মাই সেই ব্রহ্মের অখণ্ড

পরিপূর্ণ প্রকাশ। এই আত্মার দ্বারাই "সূত্রে মণিগণা ইব"—হারের মণি সকল যেমন তার সূত্রেতে গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাদের দর্শনশ্রবনাদি নানাবিধ খণ্ডজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া জ্ঞানের বা অনুভূতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখি, কর্ণের দ্বারা গন্ধ শুঁকি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শলাভ করি; এ সকলই খণ্ডজ্ঞান। রূপ ও শব্দ, শব্দ ও স্পর্শ, স্পর্শ ও গন্ধ, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিভিন্ন অনুভূতির বিষয়; আর এই সকল বিভিন্ন অনুভূতি কখনও একই কালেও জন্মিতে পারে না। প্রবল স্রোতবাহী জলপ্রবাহের, কিম্বা প্রবল ব্যাতামুখে বায়ুপ্রবাহের ন্যায় এ সকল অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে ইন্দ্রিয়ের ও মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। চক্ষু রূপই দেখে, কিন্তু এই রূপও অখণ্ড বস্তু নহে। রামের রূপ প্রথমে তার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাহারে গঠিত; তার এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে যে বর্ণের আভা ফুটিয়াছে, তাহা বিন্দু বিন্দু বর্ণের সম্মিলনে রচিত। রূপ বস্তুও অখণ্ড নহে। চক্ষু কোন রূপই একেবারে ও একই সঙ্গে সমগ্রভাবে দেখিতে পায় না। টুকরা টুকরা করিয়া চক্ষু দেখে, কিন্তু এই খণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া আত্মা বস্তুর রূপের জ্ঞান ফুটাইয়া তুলে। শব্দজ্ঞানও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সংযোগে ও সমাহারে উৎপন্ন হয়। আর আত্মাই এই বিভিন্ন ধ্বনির সংযোক্তা। এই আত্মাই আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার একত্বের ভূমি ও একীকরণের মূল সূত্র। এই আত্মাই আমাদের সকল অভিজ্ঞতার নিত্য সাক্ষী হইয়া এ সকলকে সম্ভব ও সার্থক করিতেছেন।

এই আত্মার অন্বেষণ, এই আত্ম-জিজ্ঞাসা ও যে আত্মজ্ঞানেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানই একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দ বস্তু। ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। এই আত্মাকে জানিলে আর অপর কোনও কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না। হিন্দুর দর্শন চিরদিনই এই একত্বের অন্বেষণ করিয়াছে। এই

একত্বানুভূতিই হিন্দুর অন্তঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই সহজ বুদ্ধি প্রভাবে হিন্দু সর্ব্বদা বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বিরোধের মধ্যে মিলন ও সন্ধি, বহুর মধ্যে এক, অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে লক্ষ্য করিয়াছে। এই জন্যই বিশাল বিশ্বসমস্যার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্বপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে। এই প্রেরণাতেই হিন্দু বলিয়াছে—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই। আর এই ভূমাকে হিন্দু কেবল জ্ঞানের অজ্ঞেয় ভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। এই ভূমাই সমুদায় জ্ঞানের ও সমুদায় সত্ত্বার আধার ও সম্ভাবনা রূপে রহিয়াছেন। ইনি কেবল আছেন, এই সাধারণ অস্তিত্ব মাত্র অনুভব করিয়াই হিন্দু ক্ষান্ত হয় নাই। সকল দেশের সকল তত্ত্ববিদ্যা এবং তত্ত্বমীমাংসাই কোন না কোনও আকারে এই অনন্তকে বা ভূমাকে মানিয়া লইয়াছে। হিন্দু কেবল অনন্তকে এই ভাবে মানিয়া লইয়া স্থির থাকিতে পারে নাই, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বহুবিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছে, এবং অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই ভূমাকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' রূপে আপনার আত্মার মধ্যে এই আত্মার নিত্য সিদ্ধ একত্বের মূলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই নিগূঢ় একত্বানুভূতিই হিন্দুর নিকটে সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তকে, বাস্তবের মধ্যে আদর্শকে, বুদ্ধির মধ্যেই যাহা বোদ্ধব্য, জ্ঞানের মধ্যেই যাহা নিত্য জ্ঞাতব্য, তাহাকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুর অস্থি-মজ্জা-গত এই সহজ প্রকৃতিসিদ্ধ একত্বানুভূতিই তাহার সমুদায় জ্ঞানান্বেষণ ও কর্ম্মচেষ্টার প্রেরয়িতা হইয়া হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংরাজীতে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূল সূত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে,—

"The Hindu not only **starts from Experience as a**

homogenous whole, but always in investigating the manyfold in the real world, returns to the actual synthetic unity in the *Atma*."

বারান্তরে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পৌরাণিকী কথা

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

হিন্দুর গৃহে পুরাণাদি পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই শ্লোকটি পাঠ করিতে হয়। নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তবে জয়োচ্চারণ করিবে; ইহাই হইল এই শ্লোক-টির সহজ অর্থ। এই অর্থ বোধগম্য করিতে হইলে নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং সরস্বতী, এই কয়টি শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে; পরে, পুরাণ পাঠের সময়ে জয়োচ্চারণই বা কেন করিতে হয়, তাহাও বুঝিতে হইবে; অনুষ্টুপছন্দের শ্লোকটি দেখিতে ও শুনিতে আমা-দের যত সরল বোধ হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তত সরল নহে; উহার মধ্যে অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি সিদ্ধান্ত লুকান আছে। দেখা যাউক, কয়টা গুপ্ত কথা, বা কয়টা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।

প্রথমে দেখা যাউক, নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুপুরাণের বচন ধরিয়া নারায়ণ শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর স্নূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

"নারাজাতানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেব চায়নং তস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"
"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিবা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"
"প্রকৃতেঃ পর এবাত্মঃ স নরঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তস্যেমানি চ ভূতানি নারানীতি প্রচক্ষতে।
তেষামপ্যয়নং যস্মাত্তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

ইহাই হইল নারায়ণ শব্দের পৌরাণিকী ব্যাখ্যা। ইহা ছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নারায়ণ শব্দের অন্য অর্থ আছে। অপ্ শব্দের অর্থ জল; সমঞ্জসীকৃত শক্তির যে সম্মুঢ়-ব্যাপ্তি তাহাকেও আপঃ বা নারা বলে, তাহাই যাহার অয়ন বা স্থিতির স্থান তিনিই নারায়ণ। প্রলয়কালে যখন সকল বিকশিত শক্তি সংহৃত হইয়া সামঞ্জস্যের ব্যাপ্তিতে বিস্তৃত থাকে, তখন সেই ব্যাপ্তি বা সাগরবক্ষে যিনি ভাসমান থাকেন তিনিই নরায়ণ। জগতে যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও বাহিরে স্থূলে ও সূক্ষ্মে যাহা কিছু আছে—থাকে—বা থাকিতে পারে, সে সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তিনিই নারায়ণ। অথবা নরত্বের অয়ন যিনি তিনিই নারায়ণ। যাঁহা হইতে নরজাতির উদ্ভব হয়, যাঁহার কৃপায় সেই নর নরোত্তম আখ্যা লাভ করে, তিনিই নারায়ণ। তন্ত্র বলিতেছেন যে, যত জীব, তত শিব; প্রত্যেক জীবেই ভগবানের অংশ নিত্য বিদ্যমান। ভগবান অনন্ত শক্তির অনন্ত-গুণের আধার; তাঁহার অংশও অনন্ত শক্তির ও গুণের আধার; কেন না অনন্তের অংশ কখনই সান্ত হয় না, অনন্তের অংশও অনন্ত। তাই জীবও শিব এক ও অদ্বয়। যখন জীব বুঝিতে পারে যে, আমি শিব তখনই সে শিবত্ব লাভ করে। অনন্ত শিবশক্তির অসীম সাগরের এক একটি বুদ্‌বুদ্ এক একটি সৃষ্টি, যেন এক একটি ব্রহ্মাণ্ড; সেই অনন্তকোটি বুদ্‌বুদ্ খচিত শক্তিসাগরে যিনি

লীন তিনিই নারায়ণ। সুতরাং প্রতি জীবেই নারায়ণের অংশ নিত্য বিদ্যমান; লোকসমাহার জনসঙ্ঘ নারয়ণের একটি রূপ—একটা প্রকট মূর্ত্তি।

নর শব্দের অর্থে বিষ্ণু বুঝায়; স্বয়ং জনার্দ্দনকে নর শব্দে আখ্যাত করা হইয়াছে। সুতরাং তিনিই নরোত্তম যিনি পুরুষোত্তম। নর, নরোত্তম ও নারায়ণ এই তিনই এক, একই তিন। প্রথমে বৈষ্ণবীশক্তিসম্পন্ন সজীব পুরুষ বা নর বা মানুষ; তাহার পর ধরার ভার হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি নরোত্তম বা পুরুষোত্তম; তিনিই আদর্শ পুরুষ, আদর্শ নর। এই নর এবং নরোত্তমের আধারভূত যিনি তিনিই নারায়ণ। এই তিনই যে এক, এবং এক হইতেই তিন, তাহা বলিল কে?—বুঝাইল কে? উত্তরে বলিব,—বাক্, বাণী, সরস্বতী। তিনি কি বলিয়াছেন? একমেবাঽদ্বিতীয়ম্। তিনি আর কি বলিয়াছেন? তত্ত্বমসি। তিনি আরও কি বলিয়াছেন? একোঽহং বহুস্যামঃ। শেষে তিনি দেবীসূক্তে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন,—

"ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যাভিধীয়তে"—যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনারূপিণী, যিনি রুদ্র, যিনি ইন্দ্র, যিনি মিত্র, যিনি বরুণ, যিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে, সর্ব্বত্রে সর্ব্বব্যাপারে পরিব্যাপ্তা তিনিই বুঝাইয়া দেন নর, নরোত্তম ও নারায়ণ একই, তিন ভিন্ন নহে। তিনিই বুঝাইয়া দেন যে, নর ইচ্ছা করিলে নরোত্তম হইতে পারে, শেষে নারায়ণে আত্মসংবরণ করিতে পারে; অনন্ত শক্তি সম্পন্ন জীবের উন্নতির অবধি নাই। এই বোধটুকু লাভ হইলে পর নর, নরোত্তম, নারায়ণ এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে। কেন জয়োচ্চারণ করিবে? যেহেতু এই বোধ হইলে জীবের তখন

আর কোন ভয় থাকিবে না,—শোকের ভয়, মোহের ভয়, পতনের ভয়, চিরনৈরাশ্যের ভয়—কোন ভয়ই থাকে না। যাহার দ্বারা ভয় দূর হয়, যিনি অভয় দান করেন, তাঁহাকে দেখিতে বা চিনিতে পারিলে তাঁহারই জয়োচ্চরণ করিতে হয়। পুরাণে তাঁহারই লীলা-ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। তাঁহাকে চিনিবার ও বুঝিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই পুরাণ পাঠের পূর্ব্বে ও শেষে এই ভাবে নর, নরোত্তম নারায়ণ এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া সানন্দে নারায়ণের জয়োচ্চারণ করিতে হয়।

ইহা হইল পৌরাণিকী ব্যাখ্যা। এইবার মুমুক্ষু ও ভক্তের দিক্ দিয়া কথাটা বুঝিতে হইবে। নারায়ণ অব্যক্ত পুরুষ, বেদান্ত মতে "শুদ্ধান্তর্যামিসূত্রবিরাড়াখ্যাঃ"—তিনি শুদ্ধ ও অন্তর্যামিপুরুষ।

"পাক্ষপ্যমুক্তি বচনো নারেতি চ বিদুর্বুধাঃ।
যো দেবোঽপ্যয়নং তস্য স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"
"নারাশ্চকৃত পাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতং।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"
নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতং।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

পাপের মুক্তি, নরত্বের হীনতা হইতে মুক্তি যাহা হইতে হয় তিনিই নারায়ণ। অথবা যাহা হইতে মোক্ষের জ্ঞান হয়, বন্ধন ভয় দূর হয়, তিনিই নারায়ণ। যাহা ভয় তাহাই পাপ, যাহা অভয় তাহাই পুণ্য। বাধাই ভয়, বাধাই দুঃখ; যাহার বাধা নাই, তাহার দুঃখ নাই; সুতরাং সেই নির্ভয় পুণ্যবান। যিনি বাধা হইতে, দুঃখ হইতে, ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনিই নারায়ণ। ভয় দূর হয় কেমন করিয়া? যিনি ভয়হারী তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে, তিনি যে সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা সদাই অনুভব করিতে পারিলে, তাঁহার রাজ্যে,—খাস্‌তালুকে বাস করিতে পারিলে,

তাঁহার সেবক সহচর হইয়া থাকিতে পারিলে, অথবা তাঁহাতে স্বীয় সত্ত্বা ডুবাইতে পারিলে, আর কোন ভয় থাকে না। সাযুজ্য সামীপ্য, সারূপ্য ও সালোক্য—এই চারি প্রকারের মুক্তির কোন একটি মোক্ষপদ লাভ করিতে পারিলেই নির্ভয় হওয়া যায়। ভক্ত বলেন, আমি তাঁহাতে মিশিতে চাহি না, তাঁহার আকারে আকারিত হইতে চাহি না,—আমি চাহি তাঁহার সেবা করিতে, তাঁহার লীলা-নাট্য দর্শন করিতে, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতে। পুরাণে তাঁহার লীলা-ব্যাখ্যা আছে, কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয় তাহার পদ্ধতি ও ক্রম পুরাণে লিখিত আছে, জীবন কি ভাবে পরিচালিত হইলে কোন পথে যাইলে কতকটা নির্ভয় হওয়া যায় তাহাও পুরাণে বিশদ ভাবে, অর্থবাদের আবরণে, লিখিত আছে, অতএব পুরাণ পাঠের পূর্ব্বে সেই ভয়হারী নারায়ণের নমস্কার করিতে হয়। নর কেমন করিয়া নরোত্তম হয়, সেই নরোত্তম কেমন করিয়া নারায়ণের দেহ, হইতে সঞ্জাত তাহা পুরাণের বাণীই প্রকট করিয়াছেন। যে নর নরোত্তম হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে, যে নরোত্তম নারায়ণের অংশ-স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছেন, ইঁহাদের দুইজনকে আমি প্রণাম করি। আর যে পুরাণের বাণী আমাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছে, তাহাকেও প্রণাম করি। কেবল প্রণামই নহে, সঙ্গে সঙ্গে জয়োচ্চারণ করিব; কারণ, আর ত ভয় নাই, গুরুপুরাণ আমাকে সেবার পথ, কৈঙ্কর্য্যের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সর্ব্বভয়হর, সর্ব্বতাপ-হর, সর্ব্বপাপহর শ্রীভগবানের আমি কিঙ্করতা লাভের উপায় পাইতেছি, অতএব—জয়-জয়-জয়!

পুরাণ সকল লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যেই লিখিত। সে লোক-শিক্ষাটা কেমন? সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা—মনুষ্য সকলের একী-করণেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমে যাহাদের লইয়া সংহতি তাহাদের প্রত্যেককে খাঁটি করিয়া গড়িতে হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষা না পাইলে মানুষ মানুষ হয় না, নরাকারে পশুবৎই থাকিয়া

যায়। যাহা নরত্বকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই নরের ধর্ম্ম। জীবত্ব হেতু নরে এবং পশুতে অনেক গুণ-সামান্য আছে। যে সকল গুণের জন্য নরের বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়, নর নরোত্তম হইতে পারে, তাহাই নরের বিশেষ গুণ। আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি দেহীর যে সামান্য গুণ আছে তাহা নরেও যেমন আছে, পশুতেও তেমনি আছে। পরন্তু শম দমাদি গুণসকল নরের পক্ষে বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ গুণ সকল বা মানব ধর্ম্মের সম্যক্ উন্মেষ মনুষ্যসমাজে ঘটিলে, তেমন মনুষ্য সংহতিই কার্য্য সাধিকা হয়। তাই পুরাণ আর কাহাকেও নমস্কার করেন না, কেবল 'জগদ্ধিতায় গোবিন্দায় নমোনমঃ' বলিয়া থাকেন। জগতের হিতের জন্য, সমাজের মঙ্গলকামী হইয়া পুরাণ লিখিত এবং পঠিত হয়। নর নরোত্তম হইতে শিখিলে, নরোত্তম নারায়ণের অংশ-স্বরূপ বলিয়া জানিলে, জগতের হিত নিশ্চয়ই হয়। যে বাণী এই হিতসম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন, তিনিই নর ও নরো-ত্তমের মধ্যগতা হইয়া উভয়ের পরিচয় সাধন করিয়া থাকেন। সে পরিচয়ের কথা পুরাণেই পাওয়া যায়। নরকে নরোত্তম হইতে হইলে কত অসংখ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, কতবার পড়িতে হয়, আবার উঠিতে হয়, তাহারও বিবরণ পুরাণেই পাওয়া যায়। পুরাণ কেবল ইতিহাস বা 'হিষ্টরি' নহে, উহা মানবতার উত্থান-পতনের আখ্যায়িকা মাত্র—মানবতার বিশ্লেষণ ও পরি-পোষণের উপাখ্যান মাত্র। শাস্ত্রের হিসাবে কেমন করিয়া মানুষ মানুষ হইতে পারে, তাহারই ইতিহাস পুরাণে পাওয়া যায়। তাই সে ইতিহাস পাঠের পূর্ব্বে নরনারায়ণকে প্রণাম করিতে হয়—দেবী সরস্বতীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

আমার পুরাণ কোন দেশের? "গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি,—নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" বলিয়া যে দেশে পিতৃপিণ্ড অর্পণ করিতে হয়, সেই সপ্তসরিদ্বারা বসুন্ধরাই

আমার পুরাণের দেশ—জন্মভূমি। যে জাতি বা জাতি সকল ঋষি মুনিগণের বংশধর বা বংশরক্ষক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে, তাহাদেরই পিতৃপরিচয়, পূর্ব্বগামিগণের কীর্ত্তিপরিচয়, নরত্ব উন্মেষের শ্লাঘার পরিচয়, আত্মদানের গৌরব পরিচয় এই পুরাণ সকলের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে। পুরাণ নিদ্রিতকে জাগ্রত করে, মূককে সজ্ঞান করে, বিহ্বলকে শান্ত করে, মরণভয় ভীতকে অমর করিয়া তুলে। পুরাণ দুর্ব্বলদৃষ্টি নরের ঈক্ষণ যন্ত্র, পুরাণ অন্ধের যষ্টি, বিষণ্ণের তুষ্টি, প্রমত্তের তৃপ্তি ও শান্তি। কেননা, পুরাণ আমাদের দেশের আমাদের জাতির এবং নরনারায়ণের গাথায় পরিপূর্ণ। তাই আমার বাণী, আমার মেধা, আমার স্মৃতি আমার চিত্ত, আমার বুদ্ধি—আমার সরস্বতী—আমার অনুকূল না হইলে আমার পুরাণ আমি বুঝিতে পারি না। আমার পুরাণ আমি বুঝিতে না পারিলে আমি তীর্থচ্ছিন্ন নৌকার ন্যায় অনন্তকাল সমুদ্রে মৎস্যযন্ত্রহীন হইয়া, বিক্ষিপ্তের ন্যায়, কেবল, ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াই, আমার জাতিগত, ধর্ম্মগত, বংশগত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমাতে থাকে না। পুরাণ বিশ্বমানবতা বা নারায়ণের ভূমা ভাব সংসারী জীবকে বুঝাইয়া দেন না; কারণ পুরাণ বলেন যে, বংশের ধারার প্রভাব এবং দেশবিশেষের জলবায়ুর এবং সেই দেশের বিন্যাস প্রভাব মানুষ এড়াইতে পারে না। যতদিন মানুষের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকে, ততদিন মানুষ জন্মের ও জন্মভূমির ভাব এড়াইয়া স্বতন্ত্র ও অভিনব জীবে পরিণত হইতে পারে না। তাই এই দুই সংস্কারের গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়া নরকে নরোত্তম করিবার পথ পুরাণ দেখাইয়া দিতেছেন। আমার জন্মভূমি কেবল সপ্তসরিদ্বরাই নহেন; যিনি আমার জননী, আমার জাতির জননী, আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরী, তাহারই সতীদেহের একান্ন খণ্ডের দ্বারা আমার জন্মভূমি খচিত—পবিত্রীকৃত। তাই বিশ্বজননী, আমার জননী এবং আমার জন্মভূমি,—এই তিনই এক, একই তিনে পরিব্যাপ্ত। পঞ্চা-

স্তরে আমি নর, আমার নরোত্তম এবং আমার নারায়ণ এই তিনই এক, একেই তিন পরিব্যাপ্ত। এই ত্রয়ীর বিশ্লেষণ ও সমীকরণ যাহাতে আছে তাহাই পুরাণ। সেই পুরাণ জগদ্ধিতায়—গোবিন্দায় বিনিযুক্ত।

এইবার পুরাণ শব্দের পারিভাষিক অর্থের আলোচনা করিব। পুরাণ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, উহার অর্থ "ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত-বেদার্থবর্ণিত-পঞ্চলক্ষণান্বিত শাস্ত্রম্"। অর্থাৎ পঞ্চলক্ষণযুক্ত বেদার্থ প্রকাশক এবং ব্যাসাদি মুনি প্রণীত যে শাস্ত্র তাহাই পুরাণ। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ এই,—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত—ইহাই পুরাণের পঞ্চলক্ষণ। ব্যাসাদিমুনিপ্রণীত যখন বলা হইল, তখন একা ব্যাসই অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ "ব্যাস" শব্দটা উপাধিবাচক; যাহারা শাস্ত্রব্যাখ্যাতা কথক এখনও রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে তাহাদিগকেই "ব্যাস" বলা হইয়া থাকে। অষ্টাদশ পুরাণ ভাল করিয়া পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে "ব্যাস" একজন ছিলেন না। অনেকগুলি ব্যাসের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। আবার ইহার মধ্যে আরও একটু মজার কথা আছে।" "ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাল্মীকং কাব্যমেবচ"—অর্থাৎ মহাভারত গ্রন্থকে ইতিহাস বলা হয়; বাল্মীকীরামায়ণ পুরাণও নহে, ইতিহাসও নহে, উহা কাব্য মাত্র। প্রত্যেক পুরাণে যেটুকু বংশানুচরিত আছে সেইটুকুই ইতিহাস, বাকী সব গল্প-গাছা, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা, অর্থবাদ, রোচক মাত্র। কিসের অর্থবাদ?

"ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরিজ্ঞানং সদাচার প্রবর্ত্তনং।
গতিশ্চ পরমা তত্বদ্ভক্তির্ভগবতি প্রভৌ।
তানি তে কথয়িষ্যামি সপ্রমাণানি ভূতলে॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিজ্ঞান, সাদাচারের প্রবর্ত্তন এবং ভগবানে পরমা ভক্তি যাহার দ্বারা ভূতলে প্রমাণসহ প্রচারিত হয় তাহাই পুরাণ। শাস্ত্র তিন রকমে সাধকগণের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। প্রথম—রাজবাণী; যথা বেদ ও গৃহ্য সূত্র। এখানে কেবল হুকুম, কেবল আদেশ; সে হুকুম অনুসারে কাজ করিতেই হইবে, না করিলে পাপভাগী হইতেই হইবে। দ্বিতীয়—মিত্রবাণী; যথা দর্শন শাস্ত্র। মিত্রের সহিত কথা কহিতে হইলে যেমন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া কথা কহিতে হয়; তাহাকে তর্কে হারাইয়া স্বীয় মতানুকুল করিতে হয়, তেমনি দর্শন শাস্ত্রে কেবল বিচার, কেবল তর্ক আছে। রাজাদেশের ন্যায় কোন আদেশ দর্শন শাস্ত্র করেন না,—'আমি বলিতেছি' বলিয়া কোন কথা মান্য ও গ্রাহ্য করিতে কাহাকেও বলেন না। ইহাই মিত্রবাণী। তৃতীয়—কান্তাবাণী; যথা পুরাণেতিহাস। স্ত্রীকে কোন কথা বুঝাইতে হইলে যেমন গল্পগাছা করিয়া বুঝাইতে হয়, যেমন কাহারও তুলনা দিয়া বলিতে ও বুঝাইতে হয়; পুরাণ শাস্ত্রও তেমনি বেদ এবং তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল আখ্যায়িকা ও উপাখ্যানের সাহায্যে জন সাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন। তাই পুরাণের কথাকে কান্তাবাণী বলে। পুরাণ ব্যাখ্যান শাস্ত্র, সিদ্ধান্তের শাস্ত্র নহে; বেদ, উপনিষদ্‌, তর্কশাস্ত্র যে সকল সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি সম্মত বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, গল্পের ছলে পুরাণ তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পুরাণের আবার তিন শ্রেণী আছে; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে অষ্টাদশ মহাপুরাণ বিভক্ত। সাত্ত্বিক পুরাণে মোক্ষের ও ভগবদ্‌ভক্তির কথাই প্রশস্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের লীলা-নাট্যেরই বর্ণনা হইয়াছে। বিষ্ণু, নারদ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ছয়টিই সাত্ত্বিক পুরাণ। রাজসিক পুরাণে সমাজ রক্ষা, সমাজ বিন্যাস, রাজধর্ম্ম, প্রজাপালন, জাতিরক্ষা প্রভৃতি সমাজ-তত্ত্বের কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আছে। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত,

মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম পুরাণসকলকে রাজসিক পুরাণ বলে। যাহাতে ব্যক্তিগত ঋদ্ধি সিদ্ধির কথা আছে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রবল ভাবে ফুটান হইয়াছে তাহাই তামস পুরাণ। মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ, এই কয়টাকে তামস পুরাণ বলে। সাম্প্রদায়িকতার হিসাবেও পুরাণ সকলকে উত্তম মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বৈষ্ণব বিষ্ণু নারদাদি পুরাণ সকলকে শ্রেষ্ঠ বলেন; শাক্ত ও শৈব, মার্কণ্ডেয়, শিব, স্কন্দাদি পুরাণ সকলকে শ্রেষ্ঠ পদ দিয়া থাকেন। তবে বাঙ্গালার শাক্ত এক মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ছাড়া পুরাণের আর কোন অংশ লইয়া তেমন ব্যস্ত নহেন। পুরাণের হিসাবে বল, আর ইতিহাসের হিসাবেই বল, বাঙ্গালার শাক্ত কেবল মহাভারত পাঠই শুনিতেন, আর নিত্য চণ্ডি পাঠ করিতেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কেবল শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই পাঠ করিতেন। ইংরেজের আমলের পর, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে পর বাঙ্গালার শ্রীমদ্ভাগবত গীতার আদর বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে উহা পশ্চিমের দশনামী দণ্ডী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল; গৃহস্থ গৃহে কদাচিৎ উহা পঠিত হইত। আচার্য্য রামানুজ গীতাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত-বাদ প্রচারক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রমাণবচন উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বাল্মিকীর রামায়ণ পুরাণও নহে ইতিহাসও নহে; উহা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধানকাব্যগ্রন্থ। বাল্মিকী কবিগুরু, একজন মুনি মাত্র, ঋষিও নহেন। তবে রামানুজাচার্য্যের সময় হইতে শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার মান্য করিয়া তাঁহার পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। রামানন্দ এবং পরে তুলসীদাস রামপূজার পথ উত্তর ভারতে সর্ব্বজনমান্য করিয়া যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময়ে বাঙ্গালার বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রবর্ত্তনা করেন, সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে অযোধ্যায় এবং চিত্রকুট প্রদেশে সাধারণ ভাবে রামপূজা

পদ্ধতি প্রচলিত হয়। রাম ইষ্টদেবতা নির্দ্দিষ্ট হইবার পর তবে রামায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থ রূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। পশ্চিমের রামসেবকদিগের ব্যবহার দেখিলে বলিতে হয় যে, উহারা তুলসীকৃত রামায়ণকেই ধর্ম্মগ্রন্থ রূপে গ্রাহ্য করে, বাল্মিকীরামায়ণকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তেমন মান্য করে না। বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য বৈদিকগণ আসিয়া বাস করিলে এবং গুরুর আসন প্রাপ্ত হইলে পর, রামপূজা প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ভট্টপল্লির বৈদিকগণ সবাই রামাত বৈষ্ণব; তবে তাঁহারা বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বাধ্য হইয়া তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাঁদের চেষ্টাতেই বাঙ্গালায় এক কালে রামকথার প্রচার হইয়াছিল। এই ত গেল পুরাণের কথা। ইহা ছাড়া উপপুরাণ আছে; তাহাদেরও সংখ্যা অষ্টাদশ। শাস্ত্র কোনখানে পুরাণকে গল্প গাছার গ্রন্থ ছাড়া অন্য কিছু বলেন নাই।

পুরাণাখ্যানকং বিপ্র নানাকল্প সমুদ্ভবম্।
নানা কথা সমাযুক্তমদ্ভূতং বহুবিস্তরম্॥"

কিন্তু পুরাণের স্তুতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে,—

"চতুর্ব্বর্গস্য বীজঞ্চ শতকোটী প্রবিস্তরম্।
প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণাদভবত্ততঃ॥"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের বীজ পুরাণে সমাহিত, পুরাণ পাঠ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং পুরাণ রোচক শাস্ত্র; উহার সাহায্যে নরনারী সাধন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরাণ সমাজের ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণপ্রদ; ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে সাধন পথ দেখাইয়া দেয়, তাই উহা কল্যাণপ্রদ; সমষ্টিকে মধুরভাবে বিভোর করিয়া রাখে, তাই উহা সমষ্টির মঙ্গল-সূচক। পুরাণ একলা শুনিতে নাই; আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, প্রতিবেশী পল্লিবাসী সকলকে সঙ্গে করিয়া, একস্থানে সমবেত হইয়া পুরাণ পাঠ শুনিতে হয়। প্রত্যেক পুরাণেরই দুই দিক্ দিয়া অর্থ করা

যায়; এক সমাজতত্ত্বের দিক্ দিয়া, অপর দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া। দেহতত্ত্বের একটা সিদ্ধান্ত ধরিয়া বহু পুরাণে এমন এক একটা আষাঢ়ে গল্পের সৃষ্টি করিয়া ইঙ্গিতে গুপ্তকথা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহা একটু তলাইয়া বুঝিতে গেলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ইংরেজি বুদ্ধির মাপ কাটি লইয়া পুরাণ বুঝিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। আবার বলি, পুরাণ হিষ্ট্রী নহে, তোয়ারীখ নহে—গাথা, কথা উপাখ্যান আখ্যায়িকার সমাহার মাত্র। পুরাণ সমাজ শিক্ষার যন্ত্র, সাধকের ইঙ্গিতের গ্রন্থ, সাধনার রোচক মাত্র। তাই পুরাণকে নারায়ণী শাস্ত্রও বলা হইয়া থাকে, —নরসমাজ রক্ষার—নরত্ব রক্ষার শাস্ত্র যাহা তাহাই নারায়ণী শাস্ত্র। গরুড় পুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় নর-সমাহারকে—নরত্বকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। ইংরেজিতে নারায়ণকে super-man এবং humanity দুই বলা যায়। সেই নর-নরোত্তম-নারায়ণকে বার বার প্রণাম করিয়া, নারায়ণ পরায়ণ হইয়া আজ "নারায়ণের" সেবাব্রতে দীক্ষিত হইলাম। যুগে যুগে তুমি কত রূপ ধারণ করিয়াছ, কত ভাবের প্রচার করিয়াছ; আজ নারায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া বাঙ্গালার তথা ভারতভূমির নর-নারায়ণের পুষ্টিকল্পে অবতীর্ণ হও,—আমাদের নরদেহ ধারণ সার্থক হউক।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন।

'নারায়ণ' পত্রের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর এক অতি কঠিন কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যদি আমাকে তাঁহার পত্রে 'যা-হয় একটা কিছু' লিখিবার জন্য ফরমাইস করিতেন, তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচে লেখনী ধারণ করিতে পারিতাম। অনেক বাজে জিনিস বাঙ্গালা মাসিক পত্রগুলির মারফত্ সাহিত্যের হাটে হাজির করিয়াছি,—আর একটা না হয় বাড়িবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় প্রচলিত সম্পাদকীয় মামুলী 'যা-হয় একটা কিছু' চান না,—তিনি চান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত! আমি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলাম, "ভ্রমণ ত করি না, বৃত্তান্ত আসিবে কোথা হইতে?" আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সম্পাদক মহাশয় সুধু কবি ও সাহিত্যিক নহেন, তিনি ব্যবহারাজীব—বড় বারিষ্টার—জেরায় পঞ্চমুখ। তিনি একেবারে তিন চারিটি প্রশ্ন ডিঙ্গাইয়া বলিলেন "আপনি কি কখন বৃন্দাবনে যান নাই"? অস্বীকার করিতে পারিলাম না, বলিলাম "অনেকবার গিয়াছি"। তিনি অমনি বলিয়া বসিলেন "তাহারই একবারের কথা লিখিয়া দিতে হইবে"। আমি মৌন রহিলাম, তিনি বুঝিলেন উহা সম্মতির লক্ষণ। কিন্তু আমি যে কি জন্য মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা ত তিনি বুঝিতে পারিলেন না, আমিও তখন বলিতে পারিলাম না;—যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাঁহাদের কাছে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারি না, কথা যেন কেমন বাধিয়া যায়,—আমি ঐ প্রকার অবস্থায় পড়িলে প্রায়ই চুপ করিয়া থাকি।

তখন আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তখন বলিতে পারি নাই, এখন একেলা বসিয়া লিখিতে পারি। আমার মনে হইয়াছিল আমার বয়স যে দুই যুগের উপর বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা কি ইঁহারা ভুলিয়া গেলেন? যখন 'হিমালয়' 'প্রবাসচিত্র' 'পথিক'

লিখিয়াছিলাম, তখন আমি যে পৃথিবীতে বাস করিতাম, যে ভাবের ঘোরে অভিভূত ছিলাম, সে পৃথিবীর উপর দিয়া মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে, সে ভাবের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, সে বীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সে মুক্তপক্ষ বিমানবিহারী বিহঙ্গ এখন লৌহপিঞ্জরে বসিয়া প্রতিপালকের শিখান 'রাধাকৃষ্ণ' বলে,—মনের আবেগে কথা বলিবার শক্তি সামর্থ্য তাহার নাই! সে দিন নাই, বন্ধু, সে দিন নাই!

কথাগুলি সে সময় বলিতে পারিলে হয় ত আমি এ দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতাম; কিন্তু কাজের সময় ঠিক ঠিক মত কথা বলিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয় জানিয়াও কথা বলিতে পারিলাম না। অতএব আমাকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতেই হইবে; পারি আর নাই পারি, অনুরোধ প্রতিপালন করিতেই হইবে।

তাহার পর আর একটা কথা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন। দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ লাহোর প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভাল হউক আর মন্দ হউক লেখা সহজ। অনেকে শুনিয়াছি স্থান না দেখিয়াও লিখিয়া দিতে পারেন। আমি সে বিদ্যা শিক্ষা করি নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারি না, কত ত্রুটী থাকিয়া যায়,—না দেখিয়া লেখা ত বহু দূরের কথা। তবুও না হয় দিল্লী লাহোর এক রকম করিয়া বলিয়া দিতাম; কিন্তু এ ত দিল্লী লাহোর নহে—এ বৃন্দাবন—এ ব্রজভূমি—এ কিশোর কিশোরীর লীলা নিকেতন—এ গোপগোপীর আনন্দ ভবন—এ প্রেমের নন্দন কানন—এ বৃন্দাবন! কত কত প্রেমিক ভক্ত যে স্থানের নাম স্মরণ করিয়াই প্রেমপুলকে অধীর হইয়া পড়েন, কঠোর শুষ্কহৃদয় ভজন-পূজন বিহীন আমি সেই বৃন্দাবনের কথা কেমন করিয়া বলিব। যে বৃন্দাবনের ক্রোড়বাহিনী যমুনার কথা মনে হইলেই উচ্চস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে—

"যমুনে, এই কি গো সেই যমুনে প্রবাহিনী।
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমনি।"

—সে যমুনার কথা আমি কেমন করিয়া বলিব? বৈষ্ণব কবি-গণ যে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া লেখনী ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে বৃন্দাবনের কথা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব —সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তবুও বৃন্দাবনের কথা বলিতে হইতেছে। আমি তিন চারি বার বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রথমবার যখন যাই তখনকার কথাই আজ বলিব, কারণ সেই আমার প্রথম শ্রীধাম দর্শন। আমি তখন পশ্চিম দেশে থাকিতাম; কাজ কর্ম্মের মধ্যে ভ্রমণ। এই ভ্রমণ উপলক্ষে একবার আগ্রার তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম। আগ্রার কথা বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং তাহা আর বলিয়া কাজ নাই।

আমি যখন তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম সেই সময়ে সেখা-নেই একটি ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত আমার আলাপ হয়। যুবকটি আগ্রা কলেজে বি, এ, শ্রেণীর ছাত্র। তাঁহার বাড়ী মথুরায়। তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতে আমি মথুরা বৃন্দাবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যখন শুনিলেন যে, আমি মথুরা বা বৃন্দাবন দর্শন করি নাই, তখন তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন যে, তিনি সেই রাত্রির গাড়ীতেই বাড়ী যাইতেছেন; আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে মথুরা বৃন্দাবনে যাইতে পারি। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে গেলে আমার থাকিবার খাইবার ও দেখাশুনার কোন অসুবিধাই হইবে না। এ সকল অসুবিধার কথা আমার কোন দিনই মনে হয় নাই; কি খাইব, কোথায় থাকিব, কি হইবে, এ সকল ভাবনা আমার মনে স্থান পাইলে আমি এ পথে পদার্পণ করিতাম না। কষ্ট, অসুবিধা, অনাহার, এ সকল কোন দিনই আমি গ্রাহ্য করি নাই, আমি সকলই সহ্য করিতে শিখিয়াছিলাম। তাই হিমালয়ের মধ্যে আমি মারা যাই নাই, তাই তখন আমার ভোগের শেষ হয় নাই।

মথুরা বৃন্দাবন আগ্রার অতি নিকট, আর আমারও অন্য কোথাও কাজ বহিয়া যাইতেছে না। সে সময় আমার যে প্রকার মনের অবস্থা ছিল, তাহাতে কোন রকমে দিনের পর দিন কাটিয়া গেলেই আমি বাঁচিতাম—একেবারে সকল দিনগুলি যদি একদিনে আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহাতেও আমার আপত্তির কোন কারণ ছিল না—তাহার জন্য আমি তখন প্রস্তুতই ছিলাম। সময়ের যে কোন মূল্য আছে, জীবনের যে কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমি তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আর এখন—এখন সেই পরিপূর্ণ অপব্যয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য দিবানিশি খাটিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাক্—নিজের দুঃখের কথাই পাঁচ কাহন করিয়া আর কাজ নাই।

আমি যুবকের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলাম। তখন দুইজনে তাজমহল হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে সহরের দিকে আসিতে লাগিলাম। আমি আগ্রা কেল্লার নিকট রেল ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী একটা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার সঙ্গে যে জিনিসপত্র ছিল তাহা সেখানেই রাখিয়া আহারান্তে তাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। জিনিসপত্রের কথা শুনিয়া পাঠক পাঠিকাগণ যদি ট্রঙ্ক, বাক্স, বিছানা প্রভৃতি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার কথা আমি ফিরাইয়া লইতেছি। পথে চলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই জিনিসপত্র। আমার তখন প্রয়োজন হইত দিনের মধ্যে একবার স্নান করা, আর এক বেলা হউক বা দুই বেলা হউক দুইটা আহার করা। ইহা ব্যতীত আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। আহারটা কখনও বা হোটেলে হইত, কখনও বা কাহারও বাড়ীতে 'নমো নারায়ণ' বলিয়া উঠিয়াই হইত; সুতরাং থালা গ্লাস ঘটি বাটি প্রভৃতির প্রয়োজন কোন দিনই হয় না,—লোকালয়েও না, হিমালয়েও না। এক স্নানের প্রয়োজন; তাহার জন্য একখানি কাপড় ও একখানি গামোছা সঙ্গে থাকি-

লেই হইত। তাহারা দুইজনে স্নানের ব্যবস্থা করিত এবং শয়নের সময় তাহাদের মধ্যে কাপড়খানি তোষক এবং গামোছাখানি বিছানার চাদরের কাজ করিত—আমি রাজা মহারাজার মত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতাম। এখন বুঝিলেন আমার জিনিসপত্র কি ?—একখানি কাপড় আর একখানি গামোছা। লোকালয়ে ইহাই আমার জিনিসপত্র ছিল, হিমালয়ে উহাও থাকিত না। সে কথা এখন থাকুক।

যুবকটির সহিত আসিবার সময় তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন তাঁহার পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন; পিতা মথুরার জজ আদালতের উকিল, বেশ পয়সাকড়ি পান। তাঁহার আর ভাই নাই; দুইটি ভগিনী আছেন। একটি বিধবা, তাঁহাদের বাড়ীতেই থাকেন, আর একটি সধবা, তিনি শ্বশুরগৃহেই থাকেন। যুবকের বিবাহ হয় নাই; লেখাপড়া যাহা হয় একরকম শেষ না হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিবাহিত করিবেন না। তিনি আমার পরিচয়ও গ্রহণ করিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে আমরা ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহাদের ছাত্রাবাসে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। তখন ঠিক হইল যে, আমি রাত্রিতে ষ্টেশনে যাইব এবং সেখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। রাত্রি তিনটার পর একখানি গাড়ী আগ্রা হইতে মথুরার দিকে যায়, সেই গাড়ীতে যাওয়াই স্থির হইল। যুবক আমাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর জলযোগ শেষ করিয়া আমার 'জিনিসপত্র' লইয়া ষ্টেসনে গেলাম। ধর্ম্মশালায় থাকিলে অত রাত্রিতে কে আমাকে জাগাইয়া দিবে? তাই ষ্টেসনে যাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মুসাফিরখানার বিস্তৃত কক্ষে কাপড়খানির অর্দ্ধাংশ বিছাইয়া এবং অপরার্দ্ধ জড়াইয়া তাহার উপর গামোছাখানি দিয়া একটি পরম সুন্দর উপাধান প্রস্তুত পূর্ব্বক সুখশয্যায় শয়ন করিলাম। দেখিতে দেখিতেই নিদ্রাদেবী

আমাকে তাঁহার শান্ত ক্রোড়ে স্থান দান করিলেন। কি শান্তিতে ও নিরূপদ্রবে তখন দিন কাটিত!

শেষরাত্রিতে যুবকের ডাকাডাকিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া বসিতেই যুবক বলিলেন "গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়াছে, ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, চলুন"। আমি বলিলাম "আমাকে একটু পূর্ব্বে ডাকেন নাই কেন"? তিনি বলিলেন "আপনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া এতক্ষণ ডাকি নাই; এখন চলুন"। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার 'জিনিসপত্র' গুছাইয়া বলিলাম "আপনি একটু দাঁড়ান, আমি একখানি টিকিট কিনিয়া আনি। আপনি টিকিট কিনিয়াছেন কি? কোন্ ক্লাশের টিকিট কিনিব"? তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপনাকে সে সব কিছু করিতে হইবে না। আমি আপনার টিকিটও কিনিয়াছি। এখন গাড়ীতে চলুন"। আমি বলিলাম "বহুৎ খুব্, চলুন"।

তিনি আগে আগে চলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি কয়েকখানি গাড়ী অতিক্রম করিয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। আমি তখন বলিয়া উঠিলাম "মাই ফ্রেণ্ড, ইয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী!" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "ইয়েস্ সার্, ম্যায় জান্তা হুঁ। আপ্ উঠিয়ে"। আমি বলিলাম "এ যে একেবারে ডবল প্রোমোসন"! তিনি তখন বলিলেন "আপনাকে যদি সন্ধ্যার সময় বলিয়া দিতাম যে, আপনি সেকেণ্ড ক্লাশের ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করিবেন, তাহা হইলে থার্ড ক্লাশের মুসাফিরখানায় আর আপনাকে কষ্ট পাইতে হইত না। কৈ আপনার চিজবাস্ কাঁহা।" আমি আমার জিনিসপত্র—ধুতি ও গামোছা—দেখাইয়া বলিলাম "ইহাই আমার চিজবাস্"। যুবক বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন; বোধ হয় তাঁহার এই বাইশ বৎসর বয়সের অভিজ্ঞতায় এমন লগেজ্হীন ভদ্রলোক ভ্রমণকারী দেখেন নাই।

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে তিনি বলিলেন "আপনি কোন কিছু সঙ্গে না লইয়া কেমন করিয়া বেড়ান, আপনার অসুবিধা হয় না" ? আমি বলিলাম "কিছু না। অভাব বাড়াইলেই বাড়ে, কমাইলেই কমে"। যুবক আর উত্তর করিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এইবার মথুরা বৃন্দাবনে চলিয়াছি। যুবক বিছানা ঝাড়িয়া আমাকে শয়নের জন্য অনুরোধ করিলেন; আমি বলিলাম "আর ঘুমাইব না; আমি বসিয়াই থাকিব"। যুবকও শয়ন করিল না, বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এতকাল পরে এখনও মনে আছে, সে রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। পশ্চিমাকাশ হইতে তখন চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণধারা ধরণীর উপর নিঃশেষে ঢালিয়া দিতেছিলেন; সেই কিরণে স্নাত হইয়া অদূরবর্ত্তী গ্রামগুলির বৃক্ষ সকল হাসিতেছিল, প্রশস্ত মাঠের উপর সোনার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। আর কি হইতেছিল, তাহা এতকাল পরে অকবি আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। সে যে অনেক দিনের কথা—সে যে আর একটা মানুষের স্মৃতি! সেই মানুষের স্মৃতিটুকুই আমার সম্বল আছে বলিয়া এখনও দুই এক কথা বলিতে পারিতেছি—বর্ণনা করিবার শক্তি নাই।

একটা কথা কিন্তু আমার বেশ মনে আছে—সে একটী গান। সে গানটী আমি ভুলি নাই। এখনও যখনই সেই গানটী আমার মনে পড়ে, তখনই আমার সেই প্রথম বৃন্দাবন যাত্রার কথা, সেই চন্দ্রমাশালিনী যামিনীর কথা মনে হয়। আমি সেই নিশাবসান কালে গাড়ীতে বসিয়া দাশরথি রায়ের গানটী গুণ গুণ করিয়া গাহিয়াছিলাম—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি!
ওগো ভক্ত-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।

ধর ধর জনার্দ্দন, (আমার) পাপভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংশ-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি;
যদি বল রাখাল প্রেমে, বদ্ধ আছ ব্রজধামে,
দীন হীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি।”

এত গান থাকিতে এই গানটা তখন কেন মনে হইয়াছিল, তাহা এতকাল পরে কেমন করিয়া বলিব। তখন ত ডাইরী লিখিতাম না। তখন কি আর জানিতাম যে, লেখকের মুখোস পরিয়া, সাহিত্যিকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাকে এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে হইবে। তবে, আমার মনে হয়, বৃন্দাবনে যাই-তেছি, যদি কমলাপতির বসিবার জন্য হৃদয়টাকে বৃন্দাবন করিতে পারি; তাহারই জন্য গানটা গাহিয়াছিলাম। কিন্তু তখন যে হৃদয় একটা প্রকাণ্ড মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন যে সেই মরুভূমির মধ্যে সুধু চিতার আগুন জ্বলিতেছিল! চুপ্—ও কথায় আর কাজ নাই—বৃন্দাবনের কথা বলিতে হইবে।

অতি প্রত্যূষে আমাদের গাড়ী মথুরায় পৌঁছিল, আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। গাড়ীর মধ্যে বসিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, মথু-রায় আজ আর অপেক্ষা করিব না, বরাবর বৃন্দাবনে চলিয়া যাইব। সেখান হইতে ফিরিবার সময় মথুরায় যুবকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব। গাড়ীর মধ্যে যুবককে আর সে কথা বলি নাই। ষ্টেসনে নামিয়া আমি যুবকের নিকট আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। যুবক কিছুতেই ছাড়িবেন না, অন্ততঃ এক বেলার জন্যও তাঁহার গৃহে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম “আজ আমি বৃন্দাবনে যাই, আগামী কল্য এখানে ফিরিয়া আসিব এবং যে কয়দিন আপনি বলিবেন সেই কয়দিনই আপনাদের বাড়ীতে থাকিব”। আমার বিশেষ উৎসুক্য দেখিয়া যুবক অগত্যা তখনকার জন্য আমাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন।

যে রেলগাড়ী বৃন্দাবন যায় তাহা ছাড়িতে দেড় ঘণ্টা বিলম্ব। এত বিলম্ব আমার সহিল না। যুবককে বলায় তিনি আমার জন্য একখানি ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। গাড়োয়ান তাঁহার পরিচিত। যুবক তাহাকে বলিলেন আমাকে যেন তাহাদের পাণ্ডা ব্রজবাসীর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। আমি ব্রজবাসী কাহারও গৃহে যাইতে অস্বীকার করায় তিনি বলিলেন যে, বৃন্দাবনে তাঁহার পরিচিত একজন বাঙ্গালী বাবাজী আছেন। তিনি অতি সাধু ব্যক্তি, ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃতে খুব পণ্ডিম; তাঁহার আশ্রমে গেলে আমার কোনই অসুবিধা হইবে না, তিনি আমাকে পরম যত্নে রাখিবেন। তিনি গাড়োয়ানকে সেই বাঙ্গালী বাবাজীর বাড়ীতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে তিনি তখনই আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেন, কিন্তু বাড়ীতে তাঁহার মায়ের অসুখ; তাঁহাকে না দেখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। তিনি বলিলেন, তিনি অপরাহ্নকালে বৃন্দাবনে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি তখন আমার 'জিনিস পত্র' লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। যুবক আমাকে অভিবাদন করিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

সত্য সত্যই আমি বৃন্দাবনে চলিয়াছি? আমার ত তাহা বিশ্বাস হয় না। ভক্ত বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থাদিতে যে বৃন্দাবনের বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, যে বৃন্দাবন দর্শনের জন্য কত সাধু মহাত্মা পার্থিব যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে পাগলের মত বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছিলেন, জ্ঞানশূন্য হইয়া পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন, আমিও কি সেই বৃন্দাবনে যাইতেছি? কিন্তু সে আগ্রহ কই? হৃদয়ের মধ্যে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা কই? কিছুই নাই; কিছুই নাই। আমার মত মানুষের পক্ষে তীর্থ ভ্রমণ বিড়ম্বনা। আমার পক্ষে বৃন্দাবন দর্শন অসম্ভব।

প্রাতঃকালে একাকী গাড়ীতে বসিয়া এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। এই ত বৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশীর মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছি, ঐ ত সম্মুখে বৃন্দাবন! কিন্তু সে ধবলী শ্যামলী কৈ? সে গোপনারীবৃন্দ কৈ? সে শ্যামের মধুর মুরলী-ধ্বনি কৈ? যে বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত, সে বাঁশীর স্বর কৈ? যে বাঁশীর স্বর শুনিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—

"ঐ শুন বাঁশী বাজে
বন মাঝে কি মন মাঝে।"

বাঁশী কোথায় বাজে?—বন মাঝে, কি মন মাঝে? যে শুনিতে পায়, যাহার কর্ণ শুনিবার উপযুক্ত হইয়াছে, যে সাধন বলে দিব্য কর্ণ লাভ করিয়াছে, তাহার মন মাঝেই বাঁশী বাজে; তাহার ভিতরের শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবিশ্রান্ত বাঁশী বাজে; বাঁশী 'রাধা রাধা' বলে, বাঁশী 'আয় আয়' বলে। তাই শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—

ওরে বাঁশী, বাজ ধীরে ধীরে,
এত কেন গভীর গরজ তোমার;
বাঁশী রবে গৃহে জাগে
কাল ননদী আমার।"

বাঁশী, তুমি একটু ধীরে বাজ। বাঁশী এখনও তেমনই করিয়া বাজে, এখনও যমুনা পুলিনে বংশীধারীর বাঁশী বাজিয়া থাকে; এখনও রাধা নামে সাধা বাঁশী তেমনই 'আয় আয়' বলিয়া ডাকে। কিন্তু শুনিবার মানুষ কৈ? তেমন সাধনা কার? তেমন হৃদয় ভরা প্রেম লইয়া কে বৃন্দাবনে যায়? কানুর বেণু শুনিবার জন্য কে উৎকর্ণ হয়? যে সে ভাবে যায়, তাহার বৃন্দাবন দর্শন সার্থক হয়? তাহার জীবন ধন্য হয়, সে বাঁশীর স্বর শুনিতে পায়। বলিও না এ সকল বুটবাত্—বলিও না এ সকল বাজে sentiment—বলিও না এ সকল প্রলাপ! বৈষ্ণব সাধকগণ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে; আর তাঁহাদের অপেক্ষাও যদি বড় সাক্ষী চাও, তবে, নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুসন্ধান কর, কাতরভাবে প্রার্থনা

কর, এক মনে তাঁহাকে ডাক,—তারপর—তারপর একদিন নিশ্চয়ই সেই বাঁশীর স্বর শুনিতে পাইবেই—পাইবে—পাইবে।

না—আমি এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না—এ সকল কথা লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমি গোছাইয়া কথা বলিতে পারিনা, সব গোলমাল হইয়া যায়; কিসের মধ্যে কি বলিয়া বসি। তবুও আর একবার চেষ্টা করিব—আর একবার দেখিব।

গাড়ী ধীরে ধীরে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। চারিদিকে কত কি দেখিলাম! কি দেখিলাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহা দেখিলাম তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তাহা অনির্ব্বচনীয়; তাহা স্নধু অনুভব করিতে হয়, তাহার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে হয়। সে কথা পারি ত পরে বলিব। তখন আমার গাড়ী কত মন্দির, কত আখড়া পার হইয়া একটী বাড়ীর সম্মুখে লাগিল। গাড়োয়ান নামিয়া আমাকে বলিল যে, এই সেই বাঙ্গালী বাবাজীর আশ্রম। আমি হঠাৎ আশ্রম বা কুঞ্জে প্রবেশ না করিয়া গাড়োয়ানকে পাঠাইয়া দিলাম। একটু পরেই গাড়োয়ান ফিরিয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে আসিলেন—কে? আমি অবাক্ হইয়া গেলাম, আমি প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলাম, আমি সম্ভাষণ করিতে ভুলিয়া গেলাম। বাবাজীও অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বালকের ন্যায় দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। আমার তখন হুঁস হইল, আমি অতি ধীরে বলিলাম "আমি ত আপনার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই একদিন হিমালয়ের মধ্যে দুই তিন ঘণ্টার জন্য দেখা হইয়াছিল"। তিনি বলিলেন "তাতে কি হয়, ঘণ্টা মিনিটে কি সময়ের পরিমাণ হয়; এক মিনিটের পরিচয় যে আজীবন স্থায়ী হয়। তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভুলি নাই"। যাঁহারা

আমার 'হিমালয়' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন হিমালয়ের মধ্যে এক বাঙ্গালী সাধুর সহিত একদিন একটা চটীতে আমাদের দেখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুপুত্রের অনুসন্ধানে বদরিকা-শ্রমে যাইতেছিলেন। ইনি সেই বাঙ্গালী বাবাজী। বৃন্দাবনে হাজার হাজার আশ্রম কুঞ্জ আছে; হাজার হাজার বাঙ্গালী এখানে বাস করিয়া থাকেন। আমার যুবক বন্ধু তাঁহাদের মধ্যে আর কাহারও কুঞ্জে আমাকে পাঠাইলেন না, পাঠাইলেন আমারই পরি-চিত এই সাধুর আশ্রমে। আমার যে তখন কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব।

গাড়োয়ান ভাড়া না লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে ভাড়ার টাকা দিবার জন্য ডাকিলাম। সে বলিল সে ভাড়ার টাকা মথুরায় পাইবে, চৌবে বাবুজী তাহাকে ভাড়ার টাকা লইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি ত অবাক্! চারিদিক হইতে আমার মত পাপীর উপর এ ভাবে অযাচিত কৃপা বর্ষিত হয় কেন? কি জানি কেন?

এবার এই স্থানেই আমাকে চুপ করিতে হইতেছে। বাজে বকুনিতেই স্থান জুড়িয়া যায়। কি করিব বলুন। যদি বলিবার মত করিয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে পরে একবার চেষ্টা করিব, নতুবা এই স্থানেই বিদায়।

শ্রীজলধর সেন।

আমার শিল্প

শীত কাটিয়া গেল, বসন্ত আসিল। বসন্ত বাতাসে আবার সেই তিরোহিত পরিমল। ধরণীর অঙ্গে আবার সেই পরিত্যক্ত আভরণ। কুসুম কলিকাতে আবার সেই উপভুক্ত শোভা। শিশুর বদনে আমার শৈশবের প্রথম হাসি, যাহা মিলাইয়া গিয়াছে। যুবকের প্রাণে আমার প্রথম যৌবনের অরুণ আশা, যাহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। শীতের অবসানে প্রকৃতি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু এ পরা পোষাকে আমাকে আর মুগ্ধ করিতে পারিলেন না। বসন্ত সমীরণ একদিন এ জীবনে বহিয়াছিল, সে বাতাসে কত সোনার স্বপন ভাসিয়া আসিল, স্বপ্নঘোর চক্ষে ধরিত্রী সুন্দর দেখাইয়াছিল। কিন্তু আজ এই বহা বাতাসে আমার মোহ আসে না। বিশ্ব ছবি তেমন সুন্দর হইয়া আমার নয়নে ভাসে না।

কিন্তু সে রঙ্গীন আভা না আসিলেও এ বাতাসে এক সঞ্জীবনী শক্তি আছে। এ বাতাস সুখে হোক, দুঃখে হোক, চেতন অচেতন সকল পদার্থকে জাগাইয়া তুলিতে জানে। সকলকে ক্লীবতা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আমিও আজ উত্থিত হইয়াছি।

আমি মরি নাই। আমি যেন গতবর্ষের একটি শুষ্ক পত্রের ন্যায় সরোবরপ্রান্তে পড়িয়াছিলাম। যেন আমার প্রাণ অঙ্গারস্থিত প্রচ্ছন্ন অগ্নিকণার ন্যায় আমার মধ্যে মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। বসন্তঋতুর আবাহনে সবাই জাগিয়াছে, তাই আমিও জাগিয়াছি। তাহারা বসন্ত উৎসবে মাতিতে উঠিয়াছে, আমি দুঃখ লইয়া বেদনাতে জাগিয়াছি।

আজ যেন কোন মহাপুরুষের বোধনের নিমিত্ত কোন মহাসভায় বহুবিধ রাগিনীর আলাপ সূচনা হইতেছে। আমি যেন বীণার ছিন্ন-তন্ত্রীর ন্যায় সুরভ্রষ্ট হইয়া একপার্শ্বে পড়িয়া আছি। উৎসব বাদ্যের নহবতে আমার তান মিলাইতে পারিলাম না।

তাই আজ একপ্রান্তে এই শিলাতলে উপবেশন করিয়া জীবনের পূর্ব্বকাহিনী অনুরাগভরে কল্পনা করিতে করিতে প্রাণ করুণরসে সিঞ্চিত হইয়া আসিল। একটি পূর্ব্বশ্রুত সুর কাণে বাজিতেছিল—

কিসের কুহকে মন
মরণের বিমোহন
ছায়া করে আলিঙ্গন
আবেগ ভরে।
সাধ কিরে হবে পূর্ণ,
পরাণ যে শক্তিশূন্য,
আশারে করেছি চূর্ণ
নিরাশার ভারে!

এমন সময়ে অভ্যন্তর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—কেন কাঁদ? যাহা কালসাগরে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ছায়াময়ী কল্পনার দ্বারা কি জীবনসমস্যার ভঞ্জন হইবে?

আমি কেন কাঁদি! শুনিবে কেন কাঁদি? আমার প্রাণের রূপ দেখিতে পুনরায় সাধ হইয়াছে। কুসুমে কমনীয়তা আছে, কোকিলে কুহুস্বর আছে, সলিলে স্বচ্ছতা আছে, সমুদ্রগর্ভে মুক্তা আছে, আকাশে নক্ষত্র আছে, বসুন্ধরায় সম্পদের অভাব নাই; এত থাকিতেও এ প্রাণের দর্পণ মিলিল না, তাই এ ক্রন্দন। প্রাণের স্বরূপ মিলিল না যদি, তবে কেন বিশ্ব অসুন্দর হইল না। কেন বা চিরশ্রান্তিবোধ আসিল না, বিরাগ জন্মাইল না। কই, তাহা ত হইল না।

আজও কেন তনু মম যৌবনেতে ভরা,
শ্যামল-পল্লব-লতা-প্রস্ফুটিত ধরা!
পূর্ণিমা রজনী কেন, আকাশে চাঁদিনী,
কুলুস্বরে কেন বহে অদূরে তটিনী!

তারা দেখিয়া দেখিয়া নয়ন আজও দৃষ্টিরহিত হয় নাই, কুসুমের কমনীয় পরশে অঙ্গ অবসন্ন হয় নাই, নারসিসাসের (Narcissus) মতন স্বচ্ছ স্বভাবদর্পনে আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে আপনাকে ক্ষয় করিতে পারি নাই। হুতাশনে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বানলে আপনাকে দগ্ধসাৎ করিতে পারিলাম কই? অবিনাশী অমর আমি। অনন্ত জীবন সম্মুখে। অনন্ত পিপাসা প্রাণে। আমার অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডার কোথায়? অনন্ত দ্রষ্টা আমি, আজীবন দেখিব কাহাকে? অনন্ত জ্ঞাতা আমি, আমার অনন্ত জ্ঞেয় কই?

যদ্যপি বিনষ্ট হইলাম না, তবে প্রাণের স্বরূপকে স্থায়ী করিতে পারিলাম না কেন? নতুবা প্রাণের রূপ দেখিব কেমনে? প্রাণের প্রতিরূপকে নির্ব্বাতনিষ্কম্পদীপশিখার ন্যায় ধরিয়া রাখিব কি প্রকারে? প্রাণময়ের স্থিতিস্থাপকতা ঘুচিবে কিসে? প্রাণ থাকিতে ধৃতি কোথায়?

কৈলাসে মহাদেবও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, রূপবাসনা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষ মূর্ত্ত বাসনার প্রতিরূপ মনসিজকে চিরতরে ভস্মীভূত ও আত্মরতিকে অনাথা করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। মধ্যযুগের দান্তকবি (Dante) দান্তেরও প্রাণকে জানিবার সাধ হইয়াছিল। তিনি স্বর্গের (Beatrice) বিয়াট্রিস কল্পনা করিয়া অপার্থিবে পার্থিব তৃষ্ণা মিটাইলেন। কিন্তু কৈলাসের সে যোগবল, মধ্যযুগের সে কৌশল, আজ কোথায়? ধ্যানে বা অপার্থিব কল্পনায় প্রাণের রূপ দর্শন করিয়া থাকিতে পারি কৈ? আজ এ যুগের যাত্রীদের সে প্রাচীন মার্গ রুদ্ধ হইয়াছে। এখন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ ঘটিলে আমরা শান্তিভঙ্গ করি, প্রত্যক্ষ ও কল্পনায় সংগ্রাম বাঁধিলেই বিগ্রহের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলি। আর আমরা অসত্যের সহিত রফা করিতে রাজী নই। সর্ব্বসত্যকে, সর্ব্বদেবতাকে, আমরা ইচ্ছাময় রূপে জানিয়াছি। আজ আমিই বিশ্বের কেন্দ্র। বিশ্বে লীন হইতে পারি না। আকাশের চাঁদ যেমন কিরণ-

ধারা বিস্তারে শূন্যের সকল দিক, সকল প্রান্ত, ছাইয়া ফেলিলেও শূন্যে বিলীন হইতে অসমর্থ।

এই বিশ্বরূপ ও আত্মচৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয়। কৃষ্ণপক্ষে আঁধার রাতে খদ্যোতপুঞ্জের সন্তরণ দেখিয়াছ কি? মনে কর সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন খদ্যোতসঙ্কুল শূন্যসাগরই বিশ্বরূপ, ও অগণন খদ্যোতের প্রত্যেকটিই যেন সেই আঁধার সাগরে সন্তরনকারী জীব। খদ্যোতের দেহনিঃসৃত তেজঃপদার্থ যেন জীবের চৈতন্য। মাঝে মাঝে খদ্যোত জ্বলিয়া উঠে ও আপনার প্রদীপ্ত প্রাণের আগুনে স্বসত্তা ও স্বাধারকে একাকার করিয়া দেয়। আবার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, স্ফুলিঙ্গ হইতে পুনরায় খদ্যোতে পরিবর্ত্তিত হয়। অথবা বাষ্পীয় পোতের চক্র যেমন মগ্নোত্থিত হইতে হইতে সমুদ্রের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া চলিয়া যায়, বিশ্বরূপ ও জীবচৈতন্যের সম্বন্ধও সেইরূপ।

হে আমার বিশ্ব, একদিন জ্বলিয়া উঠিয়া তোমার সহিত একাকার হইয়াছিলাম। সেদিন যেন আকস্মিক উল্কাপাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আলোকময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কই, সর্ব্বদা ত জ্বলিতে পারি না। প্রাণের আগুন যে ক্ষণে ক্ষণে নিবিয়া যায়। না জ্বলিলে তোমার সহিত মেশা যায় না। আজ প্রাণের আগুন নিবিয়া গেছে। তাই আঁধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। তাই তুমিও আমি উভয়েই আঁধারে। সেই ভাল। আঁধারে থাকিয়া আলোকের মহিমা বোঝাই ত ভাল। সব যদি আলোকময় হয়, আঁধার থাকিবে কোথায়? আঁধার না থাকিলে জ্বলিবে কে? চক্ষু ফুটিবে কার? হে বিশ্ব, তোমার আঁধার রাতে খদ্যোত যদি বারে বারে জ্বলিয়া না উঠিত, তবে অমাবস্যার নিশাকে আলোক প্রদান করিত কে? শুধু আগুনে চলে না ইন্ধনও চাই। শুদ্ধপ্রেম উদ্দীপক অভাবে অনাথ হইয়া কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়? প্রেমিকপ্রেমিকার হৃদয়সংঘর্ষণে মান অভিমানের অভাবে প্রেম কোথায় অবস্থান করে? সূর্য্যের কিরণ

যদি তুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরকে চুম্বন না করিত, তবে বর্ণ-ভঙ্গিমা কোথায় ফুটিয়া উঠিত ?

এই বর্ণ-ভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। এই যে ভগবান অক্ষয় সংসার পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই যে ভবের হাট বসিয়া গিয়াছে, এই যে বিচিত্র রঙ্গ বেরঙ্গ মেলা, ইহা কবে, কোথা হইতে আসিল ! কেমনে এক অনির্ব্বচনীয়, অবর্ণ, অরূপী, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণরূপে প্রতি-ভাসিত হইল ! যেমন সমান্তরাল সমান আয়তনের দুইখানি দর্প-ণের মধ্যে কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মাণ হইলে, সেই ব্যক্তির আকৃতি একখানি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, পরে দর্পণগত বিম্ব অপর দর্পণে প্রতিফলিত হয়, এবং এই বিম্বপ্রতিবিম্বের প্রতিভাসক্রিয়া অনন্ত ধারায় অনন্তকাল চলিতে থাকে, ভগবান ও জীবের ভবলীলাও কি সেইরূপ ?

আজ আমি এই দর্পণে নিজের প্রাণের প্রতিরূপ দেখিতে চাই। আমার প্রাণের রূপ মিলিল না বলিয়া আমি কাঁদি।

আমার প্রাণের রূপ দেখিতে আমার সাধ হইয়াছে। কেন, সে রূপ কি আমার মুখচ্ছায়ায়, অঙ্গকান্তিতে, প্রকাশিত নয় ? আমার আকৃতিতে, অঙ্গসৌষ্ঠবে, অঙ্কিত নহে ? তাই যদি হয়, তবে এক-খানা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়।

কিন্তু কই, তাহা ত হয় না, নয়ন নিজের রূপ দেখিয়া তৃপ্তি পায় না। নয়ন কখনও পশ্চাদ্দর্শী নয়, আনতপল্লবও নয়, সদাই সম্মুখদর্শী। বর্ত্তমানের বেষ্টনী ? এ জীবনে যাহা দেখি-য়াছি, যাহা শুনিয়াছি, সমাজের যে রীতিনীতি সংস্কার প্রণালীতে বর্দ্ধিত হইয়াছি, আমার সমসাময়িক ভাবস্রোত যাহা রক্তপ্রবাহের ন্যায় অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, সে সকলই ত আমার অন্তর্গত। অতীতের ইতিহাস ? আমিই ত অতীতের প্রতিনিধি, সেই অতীতের আশ্রয় ত আমারই কল্পনা, আমারই স্মৃতি। তবে তাহাতে আর জানিবার আছে কি ? দেখিবার আছে কি ? যাহা দেখিয়াছি তাহা